কার্লো কল্লোদি'র

কাঠের মানুষ

# পিনোকিও

অনুবাদ ● রূপান্তর

ফাদার মারিনো রিগন | তারেক রেজা

কাঠের মানুষ

# পিনোকিও

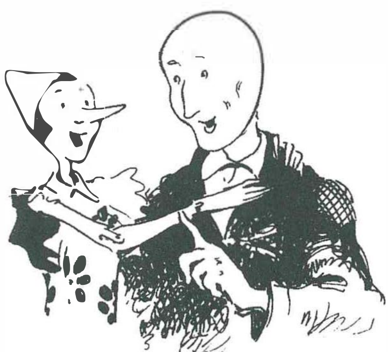

কার্লো কল্লোদি'র

কাঠের মানুষ

# পিনোকিও

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : ফিওরেন্সো ফাওর্জী

অনুবাদ ● রূপান্তর

ফাদার মারিনো রিগন | তারেক রেজা

একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি

কার্লো কল্লোদি'র
**কাঠের মানুষ পিনোকিও**
ফাদার মারিনো রিগন - তারেক রেজা

প্রকাশ : ২০০৯

© ফাদার মারিনো রিগন

**প্রকাশক**
মিসেস শাহিনা রহমান, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি
প্রান্তিক, এ্যাপার্টমেন্ট - ডি/২, বাড়ি - ৭০/১, রোড-৬/এ,
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৮১২৫৩৯৪, ০৬৬৬২৬০৩২৫৪
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২ ৮১১ ৭২৭৭

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : ফিওরেন্সো ফাওর্জী

মুদ্রক : প্রোব প্রিন্টার্স লি., বাড়ি ১০বি, রোড ৯, ধানমন্ডি, ঢাকা

আই এস বি এন : ৯৮৪ ০৮ ০২৫১ ৮

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

***Carlo Collodi***
***Pinocchio***
***Kather Manush Pinocchio***

Translated by : Father Marino Rigon
Adapted by : Tareq Reja

***Illustrations : Fiorenzo Faorzi***
***By Kind Concession of Adriano Salani Editore S.p.A.***
***Milano (Italy)***

Published : 2009
by Ms. Shahina Rahman, Academic Press & Publishers Library
Prantik, Apartment # D2, House # 70/1, Road # 6/A,
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
Phone : 8125394, 06662603254
E-mail: appl@dhaka.net
Fax : +880 2 811 7277

ISBN : 984 08 0251 8

Price : Tk. 250 .00
US$ 10 .00

উৎসর্গ

**ড. ইতালা ওখ্যি**

ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত

Dedicated to

**Dr. Itala Occhi**

*The Ambassador of Italy in Bangladesh*

# প্রসঙ্গকথা

ইতালিয়ান লেখক কার্লো কল্লোদি (১৮২৬-১৮৯০) তাঁর নন্দিত শিশুতোষ গ্রন্থ Pinocchio দিয়েই বিশ্ব জয় করেছেন। তাঁর অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ রচনার কথা শুধু ঐতিহাসিক-গবেষকবৃন্দের গ্রন্থতালিকাতেই লিপিবদ্ধ থাকলেও Pinocchio সারা বিশ্বের শৈশব-কৈশোর অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের শিশুরা পিনোকিও নামক কাঠের মানুষটিকে কেবল কার্টুনের ছবির মতোই কিছু সময়ের আনন্দ হিসেবে নেড়েচেড়ে দেখছে। কিন্তু পিনোকিও তার দীর্ঘ পথযাত্রায় নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে শ্রমে ও সাধনায় অগ্রসর হয়ে কীভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে, শিশুমনে সেই পূর্ণ বৃত্তটি নির্মাণের চেষ্টা চোখেই পড়ে না।

চিরকালের শিশু ফাদার মারিনো রিগন– যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, তপস্যা ও প্রেমের ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ বাঙালি হয়ে উঠেছেন– পিনোকিও-র সঙ্গে বাংলাদেশের শিশুদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মহৎ কাজটি করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ফাদার রিগন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির চৈতন্যের স্বরূপটি শনাক্ত করেছেন। আর আমাদের অহঙ্কার রবীন্দ্র-লালন-নজরুলকে মনে ও মস্তিস্কে ধারণ করে তিনি দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানুষ এবং লালনের সহজ মানুষের সন্ধানেই তিনি অবহেলিত-বঞ্চিতজনকে বুকে টেনে নিয়েছেন।

ফাদার রিগন বাইবেলের বাণী প্রচারের চেয়ে সার্বজনীন মানবতাকে অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে নিজেকে নিমগ্ন রাখলেন মানুষ হওয়ার সাধনায়। এই সাধনায় তিনি শিশুদেরকে সঙ্গী করলেন। তাদের মনের ভেতর মানুষ হওয়ার একটি অদম্য ইচ্ছে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নানা আয়োজনে প্রায় পুরোটা জীবনই পার করে দিলেন। এই কাঠের মানুষ পিনোকিও সেই ধারাবাহিকতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করলো।

মানুষ শব্দটি যে গভীরতর অর্থকে ধারণ করে, কাঠের পুতুল পিনোকিও সেই অর্থবহ বাস্তবতার নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেছে। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষের বেঁচে থাকা সার্থক হয়, মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে ওঠে। পিনোকিও-র জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তার অনেক কিছুই হয়তো যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মন তো সব সময় যুক্তি ও বুদ্ধির দাসত্বকে স্বীকার করতে চায় না। যা কখনো হয় না, হওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য আমাদের যে অস্থিরতা, তার একটা গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। অসম্ভবের পাথার পেরুনোর সেই রূপকথার মতোই পিনোকিও-র ঘটনাবহুল জীবন। কিন্তু যে জীবন তার

লক্ষ্য, সেই মহৎ-সুন্দর-আলোকিত-আনন্দময় মানব জীবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে পিনোকিও উচ্চারণ করেছে চিরন্তন উক্তি : সবার ওপরে মানুষ সত্য।

কাঠের মানুষ পিনোকিও-র রূপান্তরের কাজটি করতে গিয়ে আমি ফাদার রিগনের সান্নিধ্য লাভ করে আলোকিত-পুলকিত-পল্লবিত হয়েছি। তিনি চমৎকার বাংলা বলেন, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দটি খুঁজে পেতে কখনো কখনো একটু সময় নেন বটে, কিন্তু মনের ভাবকে তিনি বাংলাতেই মেলে ধরেন। ইতালিয়ান ভাষার বর্ণমালার সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই। আমি ফাদার রিগনের মুখের কথাকে বাংলাদেশি শিশুসহ সব শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনে বক্তব্যকে ছন্দোবদ্ধ করেছি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, ভাব বা বক্তব্যকে গতিময়তা দিতে চেয়েছি। পিনোকিওকে ও অন্যান্য চরিত্রকে আমি এমনভাবে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকরা এই মহৎ রচনাটিকে বাংলাদেশের মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারে। মূল ভাবের ভার বহন করবেন ফাদার মারিনো রিগন, আর চরিত্রসমূহের বাঙলায়ন ও ভাষার ব্যর্থতাটুকুর দায় শুধুই আমার।

বাংলাদেশের ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত ড. ইতালা ওখ্যি এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই বইটি পাঠ করে ইতালির শিল্প-সংস্কৃতি ও সৃজনভাবনার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় আরো নিবিড় হবে– এই ভাবনাই বোধ করি তাকে আমাদের এই প্রয়াসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফাদার সিলভানো গারেল্লো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থ প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও প্রকাশনার পুরোভাগে ছিলেন। সারাক্ষণ তিনি ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

পিনোকিও-র সত্ত্বাধিকারীর নিকট থেকে বইটি অনুবাদ এবং মূল বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ব্যবহার করার অনুমতি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন ফাদার রিগনের ছোট বোন আনুনসিয়েত্তা রিগন।

বন্ধুবর কাব্য কামরুল, যিনি ফাদার মারিনো রিগন ও আমার মাঝখানের দূরত্বটুকু তাঁর শ্রম ও সান্নিধ্য দিয়ে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। অতি অল্প সময়ে গ্রন্থটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এপিপিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহিনা রহমান এবং অন্যতম কর্মকর্তা গোলাম কবিরকে ধন্যবাদ জানাই।

তারেক রেজা
tareqreja@yahoo.com

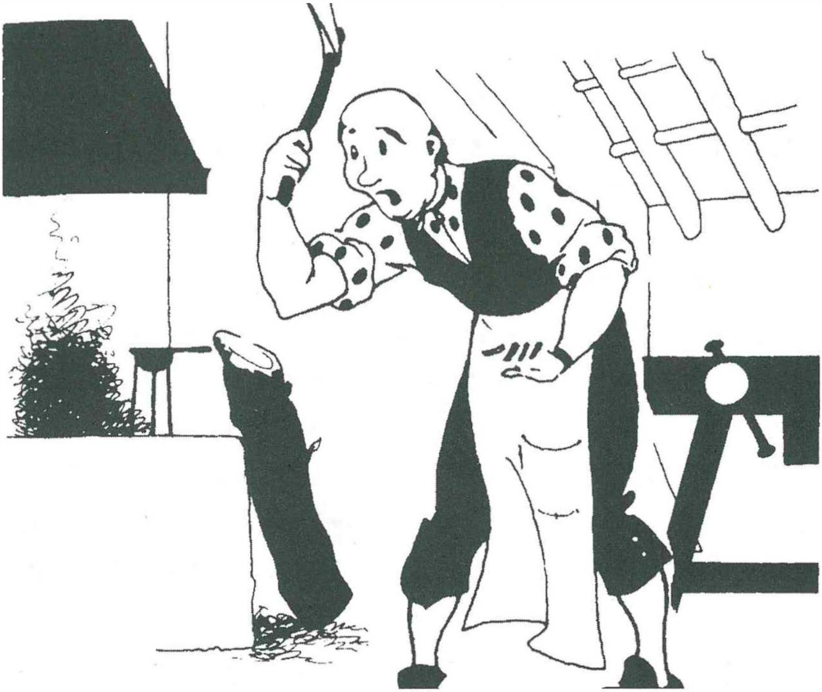

## এক

*কাঠমিস্ত্রী অবাক, শুনে কাঠের কান্না হাসি*
*কাঠের পুতুল কথা বলে, চলো দেখে আসি।*
*টুকরো কাঠের কাণ্ড দেখে চক্ষু চড়ক গাছ*
*মজার মজার গল্প আছে শুনবে তবে আজ।*

বন্ধুরা, তোমরা গল্প শুনতে খুব পছন্দ করো, তাই না? আজ আমি তোমাদেরকে একটি মজার গল্প বলবো। কি ভাবছো তোমরা? রাজা-রানী, জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, বাঘ-ভালুক, কুমির-শিয়াল, হাঁতি-ঘোড়া কিংবা সাপ-খোপের গল্প? না বন্ধুরা। আজ শোনাবো এক টুকরো কাঠের গল্প। মন খারাপ হয়ে গেল, তাই না? কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। গল্প শুনে হাসতে হাসতে

তোমাদের পেটে খিল ধরে যাবে।

বন্ধুরা, তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো তো? সামান্য এক টুকরো কাঠের কথাই আমি বলছি। তোমরা হয়তো সেই কাঠ ছুঁয়েও দেখতে চাইতে না। বড়ো জোর আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করতে। শীতের সময় তো শুকনো কাঠের আদর বেড়ে যায়। কাঠের আগুনে আমরা চাঙ্গা হই, আর বেচারা কাঠ আগুনে পুড়ে কালো কয়লা হয়ে যায়। তারপর ছাই হয়ে বাতাসের ঘাড়ে চড়ে আকাশে উড়তে থাকে।

যা হোক, আমরা সেই কাঠের টুকরোটির কথায় ফিরে আসি। বুড়ো কাঠমিস্ত্রী ঠিক কোথায় যে কাঠটি পেয়েছিলো মনে করতে পারি না। তবে বুড়ো মিস্ত্রীর নামটি আমি তোমাদের বলতে পারি। সারাদিন হাতুড়ি-বাটাল-কুড়োল-রেঁদা নিয়ে কাজ করতো বলে সবাই তাকে ডাকতো ওস্তাদ কুড়াল মিয়া নামে।

অবশ্য আরো একটি নাম ছিলো তার। পাকা পটলের মতো ছিলো তার নাকের গড়ন। তাই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবেসে ডাকতো পটল মামা।

কাঠের টুকরোটি হাতে পেয়ে পটল মামা তো মহাখুশি। আপন মনে একটু নাচতেও ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু দুষ্টু ছেলেদের নজরে পড়ার ভয়ে নাচতে পারলো না। এমন এক টুকরো কাঠই সে খুঁজছিলো। কাঠের সঙ্গেই যেন কথা বলছিলো বুড়ো মিস্ত্রি। একটু সুরে সুরে গুনগুনিয়ে–

*তোর জন্য হচ্ছে যদিও মায়া*
*তুই হবি এই টেবিলের পায়া।*

যেমন কথা তেমন কাজ। পটল মামা কুড়াল হাতে নিয়ে কাঠটিকে পায়ার গড়ন দিতে গেল। কিন্তু সেই সময়ই ঘটলো মজার এক কাণ্ড। কুড়ালটাকে ওপরে তোলামাত্র পটলের হাত পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও হাত নড়াতে পারছিলো না সে। একটা চমৎকার সঙ্গীতের সুর যেন ভেসে আসছিলো কোথা থেকে। এতো সুর নয়, যেন সুরের জাদু। খুব হালকা, মৃদু এবং মধুর সেই শিশুর কণ্ঠস্বর। মনে হলো কে যেন গেয়ে উঠলো–

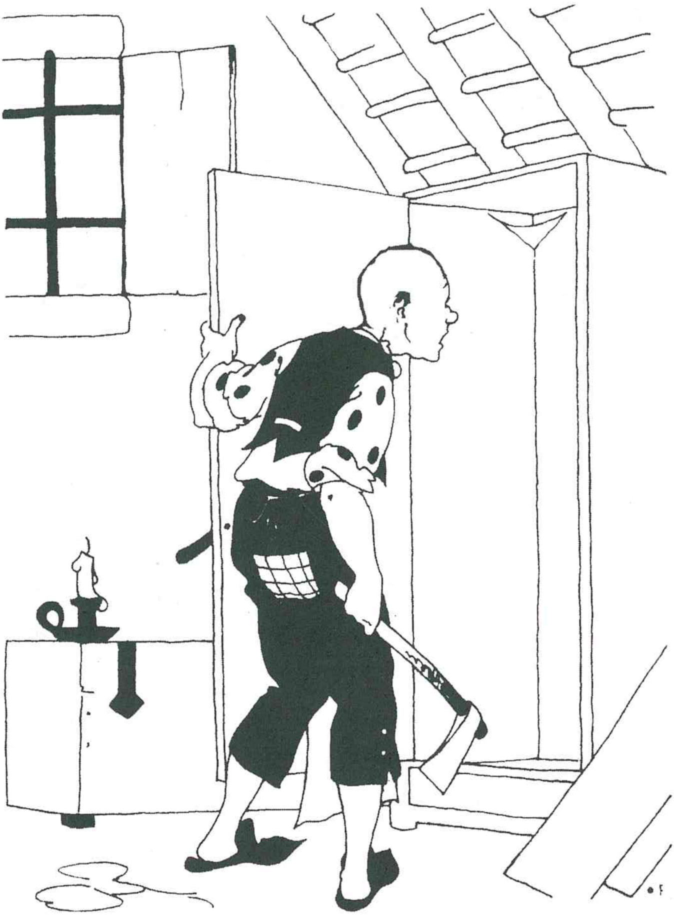

*এমন কাজ করো না*
*এতো জোরে মেরো না ।*

তোমরা একটু ভেবে দেখো, বুড়ো পটল মামার তখন মনের অবস্থা কেমন হতে পারে । এদিক সেদিক তাকিয়ে কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না সে । কৌতূহলবশত একটু ঘরের বাইরে থেকেও ঘুরে এলো । কিন্তু কোথাও কেউ নেই । টাক মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মনে মনে বললো : এ আমার মনের ভুল হবে হয়তো ।

আবার কাজে লেগে গেল পটল বুড়ো। কাঠের ওপর বসিয়ে দিলো কুড়ালের এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে একটা হায়! হায়! শব্দে ঘর ভরে গেল। এবার সঙ্গীত সত্যিকার অর্থেই গণসঙ্গীতের মতো মনে হলো–

*তুমি এতো নিঠুর হতে পারলে?*
*একেবারে বুকের ভেতর মারলে!*

আমাদের পটল মামা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। চোখ হয়ে গেল চড়ক গাছ। মুখের হাঁ কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। ক্লান্ত কুকুরের মতো ঝুলে পড়লো তার জিভ। দেখলে তোমরা হয়তো তাকে চিনতেই পারতে না। মনে হতো ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা আজব কোনো জীব। কথা বলতে গিয়ে জিভ নাড়াতে পারলো না। মাঘ মাসের শীতের সকালে খালি গায়ে থাকলে শরীর যেমন কাঁপে, বুড়ো পটল ঠিক সেইভাবে কাঁপতে লাগলো। তোতলাতে তোতলাতে বললো :

– এখানে তো কোনো জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে এই করুণ সুর বা হাহাকারের উৎস কি? তবে কাঠের টুকরোও আজকাল কথা বলতে শুরু করেছে নাকি? কিন্তু সে কথা তো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সামান্য কাঠের ঠাট্টা তামাশা সহ্য করার সময় নেই আমার। আমি এখন ক্ষুধার্ত। রান্নার জ্বালানি হিসেবে একে ব্যবহার করা যাক। আগুনে দিলে কাঠের ভেতরে বসে আমার সাথে বদমায়েশি করার মজা বুঝতে পারবে। আমার সঙ্গে বাদ্‌রামি করার উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়ছি না।

বুড়োর মেজাজের ভোল্টেজ গেলো বেড়ে। কাঠের টুকরোটাকে শক্ত করে ধরে দেয়ালে ও মেঝেতে আঘাত করে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করলো এবং কান পেতে থাকলো কোথাও গানের সুরে কোনো আবেদন ভেসে আসে কি-না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো শব্দ শোনা গেল না। এবার সে বোকার মতো হাসতে লাগলো। টুপি খুলে টাক মাথায় চুলকাতে চুলকাতে নিজেও একটু গুনগুন করার চেষ্টা করলো। কিন্তু মনের ভয় কিছুতেই দূর করতে পারলো না। বুকের ভেতর কেমন যেন উথাল পাথাল অস্থিরতা। বুকের ঢিবঢিবানি বন্ধ করার জন্য গান গাওয়ার চেষ্টা করেও সুবিধে হলো না দেখে সে কুড়াল ছেড়ে রাঁদা তুলে নিলো।

বন্ধুরা, রাঁদা বা রেঁদা হলো কাঠ মসৃণ বা সমতল করার যন্ত্রবিশেষ। এক

টুকরো শক্ত-সুন্দর-মসৃণ কাঠের মাঝখানে ছিদ্র করে তার মধ্যে লোহার ধারালো ব্লেড ঢোকানো থাকে।

কাঠের টুকরোটির শরীরের ওপর দিয়ে রাঁদাটি আসা যাওয়া করতে লাগলো আর তার শরীর থেকে খোসার মতো কাঠের গুড়োগুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কাঠ চাঁছার কাজ করতে করতেই আবার সেই অদৃশ্য সুর শুনতে পেলো পটল বুড়ো। শুকনো কাঠ বিড়বিড় করে গাইছে :

*হাহা হিহি হেসে মরি*
*দাও কেনো সুড়সুড়ি?*
*ভয়ে তুমি পুতুপুতু*
*দিও না কাতুকুতু।*

এবার বুড়ো যেন হাল ছেড়ে দিলো। শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়েছে কেউ। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। হয়তো কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়ে থাকবে সে। হুশ ফিরলে সে নিজেকে মাটির ওপর অসহায়ের মতো বসে থাকতে দেখলো। তখন যদি সে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতো তাহলে নিশ্চয়ই ভয়ে আবার বেহুশ হয়ে যেতো। এমন ভয়ঙ্কর আর বিকৃত হয়ে গেছে আমাদের কাঠমিস্ত্রি পটল মামার মুখখানি।

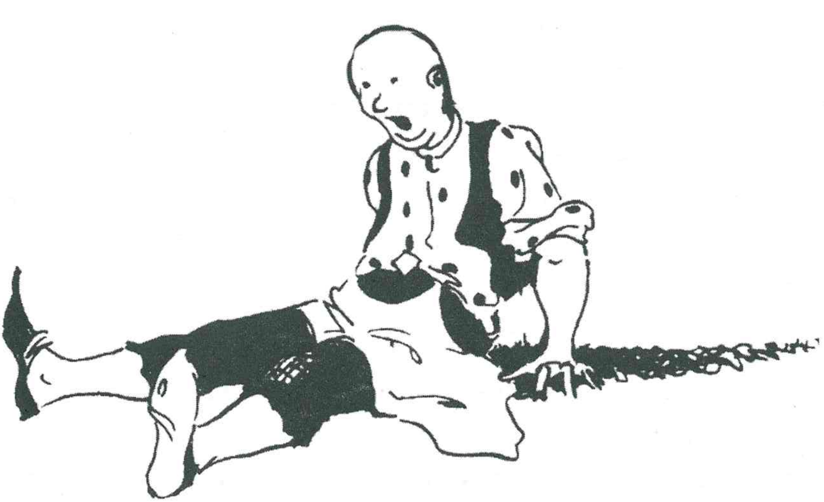

## দুই

*পটল মামার কাছে যখন বোতল মিয়া এলো*
*চমৎকার একটি কাঠের টুকরো দেখতে পেলো।*
*বোতল মিয়ার ইচ্ছে, এমন কাঠের পুতুল গড়ে*
*শিশুর মতো নাচে গায় যা, খেলাধুলা করে।*
*বিশ্ব ভ্রমণ করবে বোতল সেই পুতুল নিয়া*
*এমন মজার গল্প সবাই শোনো মন দিয়া।*

এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। করাঘাত অল্প সময়ের মধ্যেই ঝড়াঘাতে পরিণত হলো। বুড়ো কাঠমিস্ত্রি অনেক কষ্টে স্বাভাবিক হওয়ার ভান করে বললো–

–দরজা খোলা আছে। ভেতরে চলে আসুন।

উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই পটল মামার শরীরে। বেচারা পটল মামার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের মায়া হচ্ছে।

ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো মোটা ও বেটে-মতো একজন বয়স্ক লোক। পটল

মামার বয়সীই হবে হয়তো। তার পেটের দিকে তাকালে যে কারোই হাসি পাবে। কিন্তু হাসতে হবে সাবধানে। যদি সে বুঝতে পারে যে তার ভুঁড়ি দেখে হাসা হচ্ছে তাহলে তার নাকে এসে আঘাত করবে বোম্বাই ঘুসি। ভুঁড়িসমেত মানুষটাকে মনে হয় যেন ছিপি দিয়ে বন্ধ করা একটি গোলগাল গ্যাসের বোতল। ফলে বন্ধু মহলে সে বোতল মিয়া নামে পরিচিত ছিলো। এখন অবশ্য এই নামেই সবাই তাকে চিনে।

বোতল মিয়ার রাগ দেখলে বনের বাঘও নাকি ভড়কে যায়। ফলে তাকে খ্যাপানোর জন্য যদি কেউ গোলআলু বলতো, তবে তাকে দৌড়ানোর রাস্তাটা আগে ঠিক করে নিতে হতো। পেট ভর্তি গ্যাস ছিলো বলেই তো রাগের সময় কেবল ফুস্ ফাস্ করে উঠতো। এই অদ্ভুত মানুষটাকে রাগানোর জন্য দুষ্টু ছেলেরা দূর থেকেই 'গোল আলু' বলে দিতো ছুট। বোতল মিয়া রাগে গজগজ করতো আর হাতের কাছে যা-কিছু পেতো তাই নিয়েই তাড়া করতো। চলো আমরা বোতল মিয়ার সঙ্গে পটল মামার কথাবার্তা শুনি :

–আজকের সকাল আপনার জন্য শুভ হোক।

–আপনারও যেন সেই রকম হয়।

–এভাবে মাটির ওপর শরীর ছড়িয়ে দিয়ে কী করছেন বন্ধু?

–পিঁপিলিকার সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওদের অ আ ক খ, A B C D শিখাচ্ছি।

–মন্দ নয়। আপনার কল্যাণ হোক।

–এবার বলুন তো বন্ধু বোতল মিয়া, আপনার এখানে আগমনের হেতু কী? কে আপনাকে এখানে পৌঁছে দিলো? আপনি কি করে চিনলেন?

–আমি আমার পায়ের ওপর ভর ও ভরসা করেই এখানে এসেছি। বন্ধু পটল, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন ছিলো। যদি অনুমতি করেন তো প্রকাশ করি।

–নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার সেবার জন্য আমি পূর্ণ প্রস্তুত।

বেশ বিনয়ের ভঙ্গি করে জবাব দিলো পটল মিয়া।

–আপনাকে একটু খুলেই বলি। আজ সকাল থেকে একটা আইডিয়া আমার মাথার ভেতর গুতাগুতি শুরু করেছে। কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না।

–একটু অপেক্ষা করুন। গুতাগুতি করতে করতে শিং বের হলেই আপনার দাম বেড়ে যাবে। গরুর মাংসের দাম যা বেড়েছে।

–পটল মিয়া, আশা করি আপনি আর ঠাট্টা করবেন না। তাহলে আপনার মাথায় ঠাটা পড়তে পারে।

–এবার আপনার চিন্তার বিষয়টা বিস্তারিত করলে ভালো হয় না? যদি কোনো উপকারে লাগতে পারি।

–সুন্দর একটা পুতুল তৈরি করার কথা ভাবছি। সে হবে এক বিস্ময়কর পুতুল। মানবশিশুর মতোই হবে তার যাবতীয় আচরণ। যে পুতুল নাচতে নাচতে মাটিতে গড়িয়ে পড়বে, লাঠি খেলায় পারদর্শী হবে। লাফালাফি তো করবেই, এমনকি মধুর সুরে গানও গাইতে পারবে। সেই পুতুল নিয়ে আমি বিশ্বভ্রমণে বের হবো। এই পুতুল হবে আমার আয়ের উৎস। পুতুলের খেলা দেখে মানুষ আমাকে টাকা পয়সা দেবে। আমার জীবন হবে সুখের, আরামের, আনন্দের।

*বেশ বলেছো গোল আলু*
*তুমি এখন কার খালু?*
*পেট মোটা লম্বা পাও*
*ভাতের সাথে আলু খাও।*

কোথা থেকে ভেসে এলো এই ছন্দোময় শব্দগুচ্ছ বা শিশুকণ্ঠের ছড়াগান, তা দুজনের কেউই বুঝতে পারলো না। কিন্তু বোতল মিয়া গোল আলু শোনার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। রাগে বোতলের দুই কানের ভেতর দিয়ে যেন গ্যাস বের হতে লাগলো। চোখের ভেতর থেকে ঝরতে লাগলো আগুন।

–আমাকে অসম্মান করলে কিন্তু ফল ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি রেগে গেলে কিন্তু আপনার সঙ্গেই আমার লেগে যাবে তা বলে রাখছি।

–আমি কেন আপনাকে অসম্মান করবো বলুন, তাছাড়া আমি আমার অতিথি? শাস্ত্রে আছে অতিথি হলো নারায়ণ।

–কে আমাকে গানে গানে গোল আলু বলে ডাকলো?

–দেখুন গান গাওয়ার মতো মনের অবস্থা আমার এখন নয়। এমন কি ঠাট্টা করার মতো শক্তিও শরীরে নেই। আমি আপনাকে কিছুই বলি নি শ্রীমান বোতল মিয়া।

–আমি আমার নিজের কানকে অবিশ্বাস করবো? আপনিই আমার পেট নিয়ে ছড়া কেটেছেন।

–অসম্ভব। আমি বলিনি।

–বলেছেন।

–বলিনি

–বলেছেন ।

কথা কাটাকাটি বেশ জমে উঠলো । কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয় । ফলে কথার লড়াই ক্রমেই হাতাহাতি এবং গুতাগুতিতে পরিণত হলো ।

কেউ নখ দিয়ে আঘাত করে কেউবা দাঁত দিয়ে কামড়ে দেয় । কাপড় চোপড় টানাটানি থেকে শুরু করে তা চুল টানাটানি পর্যন্ত পৌঁছালো । জড়াজড়ি শেষ পর্যন্ত যখন মাটিতে গড়াগড়িতে এসে ঠেকলো, তখন দুজনেই বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলো । ঝগড়ার ঝড়ে কখন যে দুজনের টুপি বদলে গেছে কেউ খেয়ালই করে নি । কোথা থেকে কে যেন বলে উঠলো–

*বন্ধুত্বের করো বড়াই*
*করলে তো গরুর লড়াই ।*
*মাথার টুপি বদলে নাও*
*আবার বন্ধু হয়ে যাও ।*

এই কথা শুনে দুজনেই বেশ লজ্জা পেলো । দুজনে যে যার টুপি অদলবদল করে গলাগলি ও কোলাকুলি করে প্রতিজ্ঞা করলো যে, জীবনে আর এইরকম ঝগড়ায় জড়াবে না । কাঠমিস্ত্রি পটল মিয়া বোতল মিয়াকে বললো–

–বন্ধু বোতল মিয়া! বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আপনি এখন আমার কাছে কি আশা করেন? আপনি যা চাইবেন আমি এই মুহূর্তে তাই দিতেই প্রস্তুত।

–আমি আপনার কাছে এক টুকরো কাঠ পেলেই খুশি বন্ধু। আপনার উপহার দেয়া কাঠের টুকরো দিয়ে-ই আমি আমার স্বপ্নের পুতুলটি গড়তে চাই।

আমাদের পটল মামা তো আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। যে কাঠ তার শান্তি নষ্ট করেছে, তার পিলে চমকে দিয়েছে, এবার সেই আপদ বিদায় করার চমৎকার সুযোগ তার হাতে এসেছে। কিন্তু কাঠ দিতে গিয়েই শুরু হলো আরেক বিপদ। কাঠের টুকরো এমনভাবে নড়াচড়া করতে লাগলো যে দিতে গিয়ে একেবারে বোতল মিয়ার পায়ের ওপর গিয়ে পড়লো। বোতল মিয়া তো রেগে অস্থির। চোখ লাল করে গজগজ করতে করতে বললো–

–আপনার দানের সত্যিই তুলনা হয় না বন্ধু। এমনভাবে দান করলেন যাতে আপনার দান নিয়ে পায়ে হেঁটে আর বাড়ি পৌঁছাতে না পারি। আমাকে খোঁড়া করার এ এক চমৎকার কৌশল।

–বিশ্বাস করেন বন্ধু, আমি এ কাজ করি নি।

–তাহলে কে করেছে? আমি নিজেই নিজেকে খোঁড়া করেছি বলতে চান?

–এই বদমাশ কাঠটাই আপনাকে এমন নাজেহাল করছে। এ বড়ো বেহায়া কাঠ।

–কাঠের দোষ মেনে নিলেও তো আপনাকে নির্দোষ ভাবতে পারি না, কারণ আপনিই তো আমার পায়ের ওপর এটা ফেলে দিলেন।

–অসম্ভব। আমি আপনার পায়ে ফেলি নি।

–আপনি একটা ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী।

–আমাকে এসব আজেবাজে কথা বললে কিন্তু আমি আপনার পেটের ভেতর গ্যাসের খনি আছে তা সবাইকে বলে দেবো–

*পেট মোটা গ্যাসের বোঝা*
*গ্যাসের ভারে হয় না সোজা*

–আপনি একটা ইঁদুর।

–গ্যাসের বোতল।

–টিকটিকি।

–গ্যাসের বোতল।

–জোঁক।

–গ্যাসের বোতল।

বোতল মিয়া এবার দুই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। আবার শুরু হয়ে গেল মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধশেষে যে যার শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণটা অনুমান করার চেষ্টা করলো। পটল মিয়ার কানের একটা অংশ খুঁজে পাওয়া গেল না। আর বোতল মিয়ার নাকটা ঘুসি খেয়ে একেবারে থেবলে গেছে। সমীকরণের নিয়মে দুদিকেই সমান থাকায় আবার সহজেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতিজ্ঞা করলো। অবশেষে দুজনে করমর্দন, কোলাকুলি ও গলাগলি করে বিস্ময়কর সেই কাঠের টুকরোটি নিয়ে বোতল মিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। যেতে যেতে বারবার নিজের নাকে হাত বুলাচ্ছিলো আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো। কেউ দেখে ফেলছে কি-না। ভয় পাচ্ছিলো। সবাই মিলে আবার তাকে থ্যাবড়া নাকো বোতল ভূত বলে না ডাকে।

## তিন

*বাড়ি এসে বোতল মিয়া লেগে গেল কাজে*
*কাঠের পুতুল দুষ্টু অতি কথা শোনে না যে!*
*বোতল মিয়ার পুতুল সোনা হবে সবার প্রিয়*
*আদর করে নাম রাখিল মাস্টার পিনোকিও ।*

পাখির বাসার মতোই ছোট্ট ঘর বোতল মিয়ার। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একটা পুরানো চেয়ার থাকলেও তা এমন নড়বড়ে যে ব্যবহারের অযোগ্য। আছে একটা পায়া ভাঙা টেবিল। একটা চুলোর ছবি আছে দেয়ালের গায়ে একপাশে। ছবিটায় এমনভাবে আগুন জ্বলছে যেন একেবারে সত্যিকারের আগুন। জ্বলন্ত-চুলোর আগুনের উপরে আঁকা আছে একটা কড়াই। কড়াই থেকে মেঘের মতো ধোঁয়া উড়ছে ।

বাড়িতে গিয়ে বোতল মিয়া যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেল। তাকে তৈরি করতে হবে মনের মতো একটি কাঠের পুতুল। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই বোতল মিয়া ভাবতে লাগলো : এই পুতুলের কী নাম রাখা যায়। নাম নির্বাচন করার জন্য বোতল মিয়া বর্ণমালাগুলোকে সুরে সুরে আবৃত্তি করতে লাগলো : ক খ গ

ঘ ঙ।

মনে হলো তাঁর কানের কাছে কে যেন বললো : পি নো কি ও।

আবার প্রথম থেকে শুরু করলো সে : ক খ গ ঘ ঙ।

একইভাবে কানে এলো, কে যেন ঠিক তার মতোই সুর করে বলছে : পি নো কি ও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো বোতল মিয়া। এই পুতুলের নাম রাখা হবে পিনোকিও। নাম রাখার সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করলো তার। কী সুন্দর নাম। পিনোকিও। মনে মনে ভাবলো এই নামে নিশ্চয়ই পুতুলের ভাগ্য খুলে যাবে। আর পুতুলের ভাগ্যের জোরেই তো কপাল ফিরবে বোতল মিয়ার।

এসব ভাবতে ভাবতেই মনে হলো এই নামটি যেন তার খুব চেনা। হ্যা মনে পড়েছে। এই নামের একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ছিলো তার। পিনোকিও-র বাবা মা ভাই বোন সবার নামই ছিলো পিনোকিও। আর তাদের সবার দিনকালও বেশ ভালোই যাচ্ছিলো। তাদের আর্থিক অবস্থার কথা মনে পড়ায় হাসি পেলো বোতল মিয়ার। তাদের পরিবারের সবচেয়ে ধনী ছিলো যে, সে ছিলো একজন ভিক্ষুক।

বোতল মিয়া মনের আনন্দে পিনোকিও-র রূপ দিতে লাগলো। কল্পনার চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইলো পিনোকিও-কে। পুতুলের মাথা চোখ কপাল চুল তৈরি হয়ে গেল। চোখ তৈরি শেষ হতেই পিনোকিও চোখের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিলো। জীবন্ত মানুষের চোখের মতোই নড়েচড়ে উঠলো সেই চোখ, আর তা স্থিরভাবে বোতল মিয়ার চোখের দিকে চেয়ে রইলো। বোতল মিয়ার তখন কী যে আনন্দ!

খুব মায়া হলো তার। মনে হলো এই কাঠের পুতুল কী যেন বলতে চাইছে তাকে। বোতল মিয়া একটু আদর করে দিলো পুতুলটিকে। বাচ্চাদের মতো করে বললো :

–এই দুষ্টু ছেলে, এভাবে তাকিয়ে কী দেখছো তুমি?

পুতুল নীরবে তাকিয়েই রইলো। বোতল মিয়া সময় নষ্ট না করে আবার কাজে লেগে গেল। এবার নাক গড়ার দিকে মনোযোগ দিলো সে। আদর করার জন্য খুব সুন্দর করে একটা নাক গড়াও হলো। কিন্তু নাক গড়েই মহা মুশকিলে পড়ে

গেল সে। নাক কেবলই লম্বা হয়ে যাচ্ছে। লম্বা হতে হতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল বিরাট মস্ত লম্বা হয়ে গেল। বোতল মিয়া হতভম্ব হয়ে নাক কেটে স্বাভাবিক আকার দেয়া চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু যতোই ছোট করে ততোই বাড়তে থাকে।

ক্লান্ত হয়ে বোতল মিয়া এবার নাক ছেড়ে মুখ গড়তে শুরু করলো। মুখের কাজে আরো বেশি মনোযোগী হলো সে। মুখ সুন্দর না হলে তো আর সবার মনের মতো পুতুল গড়া হলো না। কিন্তু মুখ তৈরি করে আরেক ঝামেলা শুরু হলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মুখ শেষ না হতেই সেই মুখ হাসাহাসি ও নানারকম ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করলো। বোতল মিয়া শাসন করার চেষ্টা করলো:

–হাসাহাসি করো না বলছি।

পিনোকিও বোতল মিয়ার কথায় মোটেই কান দিলো না।

একটু রাগ হলো তার। বিরক্ত হয়ে বললো :

–একদম মুখ বন্ধ। হাসাহাসি চলবে না।

কথাগুলো চিৎকারের মতো শোনালো। পিনোকিও-র হাসি বন্ধ হলো বটে কিন্তু পুরো জিবটাই সে বের করে রাখলো। হাসি পেলো বোতল মিয়ার। কিন্তু মুখ গম্ভীর করেই কাজে মন দিলো সে। মুখের বাকি কাজটুকু শেষ করে সে একে একে গলা, পেট ও হাত তৈরি করলো। হাত তৈরি শেষ হতেই বোতল মিয়া দেখলো, তার মাথার টুপি উধাও। এদিক সেদিক খুঁজে দেখলো, টুপি পিনোকিও-র হাতে চলে গেছে ।

মেজাজ খারাপ হলো তার। ধমকের সুরে বললো :

–এসব কী হচ্ছে? এক্ষুণি আমার টুপি ফিরিয়ে দাও।

ততোক্ষণে টুপি চলে গেছে পিনোকিও-র মাথায়। টুপিটা এতো বড়ো যে পিনোকিও-র পুরো মাথাটাই টুপির ভেতর ঢুকে গেছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। বোতল মিয়ার রাগ বাড়তে লাগলো। কিন্তু রাগ করে তো আর পুতুলকে কথা শোনানো যাবে না। তাই একটু আদর মিশিয়েই বললো :

–খুব দুষ্টুমি হচ্ছে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও সোনা। বাবার সাথে এমন করতে নেই। একটু শান্ত হও। আমি আমার কাজ শেষ করি। বলেই আবার কাজে মন দিলো সে।

এবার উরু আর পা বানাতে হবে।

পায়ের কাজ শেষ করেই বোতল মিয়া প্রায় তিন হাত পেছনে চলে গেল। বুঝে ওঠার আগেই একটা লাথি এসে পড়েছে তার নাকের ডগায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসে এদিক সেদিক তাকালো সে। কেউ দেখে ফেললো কি না। না, কেউ দেখে নি। নিজেকে খুব বোকা আর অসহায় মনে হলো তার। মনে মনে বললো :

–আমি একটা আস্ত গাধা। তা না হলে কি পুতুলের এমন সাহস হয়। এখন

এবার সে পুতুলটাকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করালো। বাচ্চা ছেলের মতো করেই হাঁটা শেখাতে শুরু করলো বোতল মিয়া।

কিন্তু পিনোকিও হাঁটতে পারছিলো না। পা চলছিলো না ভালো করে। কি করে পা চলবে? তার পা তো নড়াচড়াই করছিলো না। বোতল মিয়ার পা ধরে ধরে

এগিয়ে দিচ্ছিলো। ধীরে ধীরে পায়ে গতি এলো। নিজে নিজেই হাঁটতে শিখে গেল। তারপর ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। বেড়ে গেল দুষ্টুমির মাত্রা।

হাঁটতে হাঁটতে দৌড়াতে শুরু করলো পিনোকিও। দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। রাস্তায় এসে সে দ্রুত বেগে দৌড়াতে লাগলো। বোতল মিয়া তার বিশাল পেট নিয়ে দৌড়াচ্ছে পিনোকিও-র সাথে। কাঠের পুতুলের দৌড়ানোর সময় ঘোড়ার পায়ের মতো ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হচ্ছিলো। বোতল মিয়া চিৎকার করে পথচারির সাহায্য চাইলো। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে পুতুলের দৌড় দেখে মজা পাচ্ছিলো এবং হাতে তালি দিচ্ছিলো। এমন মজার দৃশ্য তারা জীবনেও দেখে নাই। সবাই 'সাবাশ' 'সাবাশ' বলে বাহবা দিচ্ছিলো পুতুলকে। বোতল মিয়ার চিৎকার এবং পথচারি দর্শকের হইহই রইরই শুনে একজন পুলিশ সেই দিকে ছুটে এলো। কাঠের পুতুলের এমন দৌড়ানো দেখে পুলিশ নিজেও অবাক। কৌতূহলবশে সে রাস্তার মাঝখানে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ালো। দুষ্টু পুতুল সেই দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলো। প্রায় চলেই গিয়েছিলো। সমস্যা করলো পুতুলের সেই লম্বা নাক। ছুটে পালানোর সময় পিনোকিও-র লম্বা নাকটি খপ্ করে ধরে ফেললো পুলিশ।

পুতুলকে তার মালিক বোতল মিয়ার কাছে তুলে দেয়া হলো। বোতল মিয়ার তখন মেজাজ গরম। পুতুলকে শাস্তি দেয়ার জন্য কান ধরে টানার চেষ্টা করলো। কিন্তু কান খুঁজতে গিয়েই অবাক হয়ে গেল বোতল মিয়া। একি কাণ্ড! কান তৈরি করতেই ভুলে গেছে সে? একটু হাসিই পেলো তার। কিন্তু এখন হাসলে চলবে না। কান নেই তো কী হয়েছে। নাক ধরে টেনে নিয়ে চললো সে। ধমক দিয়ে বললো, আজ ঘরে নিয়ে তোমাকে আসল মজাটা দেখাবো। বোতল মিয়ার কথা শুনে পিনোকিও মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কান্না জুড়ে দিলো সে। সে কিছুতেই ঘরে যাবে না। কাঠের পুতুলের এমন কান্নাকাটি লাফালাফি দাপাদাপি দেখে সবাই সেখানে জড়ো হলো। সবার মায়া হলো কাঠের পুতুলের জন্য। নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো। একজন বললো :

–তোমার শরীরে দেখছি দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই। একটা কাঠের পুতুলকে কেউ এমন করে মারে? আমাদের সামনেই যেভাবে পেটাতে চাচ্ছো, বাড়িতে নিয়ে না জানি কি করো।

আরেকজন সুযোগ পেয়ে বোতল মিয়াকে দুই কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়লো না। বললো :

—ব্যাটা বোতল একটা বদমাসের হাড্ডি। বেচারা পুতুলকে হয়তো বাড়িতে নিয়ে মেরেই ফেলবে।

এইসব কথাবার্তা আলাপ আলোচনা শুনে পুলিশের মনেও যেন সন্দেহ হলো। সে এবার বোতল মিয়াকেই শক্ত করে বেঁধে ফেললো আর কাঠের পুতুলকে মুক্ত করে দিলো। হতভাগ্য বোতল মিয়াকে পুলিশ নিয়ে চললো কারাগারে।

বোতল মিয়া কান্নাকাটি করে, হাতে পায়ে ধরেও মুক্তি পেলো না। কারাগারে বসেও আপন মনে চোখের জল ফেললো সে। কিন্তু পুলিশের পাষাণ মন তো আর চোখের পানিতে গলে না। এবার নিজের ছেলের ওপরই সব রাগ গিয়ে জমা হলো। রাগে দুঃখে অভিমানে বলতে লাগলো :

—পাজি ছেলে কোথাকার। তোমার ভালোর জন্যই তো আমার এতো চেষ্টা। মনের মতো করে তোমাকে তৈরি করতে চাইলাম। আর তুমি আমাকে জেলের ভাত খাওয়ালে। আমারই ভুল হয়েছে। নিজের বোকামির জন্যই আজ আমার এই দশা। এজন্যই তো মুরুব্বিরা বলেন– ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

*ঝড়ের বেগে বাড়ি ফিরে পিনোকিও*
*ভাবছিলো সে, এমন মজার দুষ্টুমিও!*
*বাবা তাকে ভেবেছিলো মূর্খ বোকা*
*এমন সময় ডেকে ওঠে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা।*
*ঝিঁ-ঝিঁ পোকা মহাপণ্ডিত বিজ্ঞজন*
*উপদেশে করবে তাকে সংশোধন?*

বন্ধুরা, দেখলে তো পিনোকিও কিভাবে বোতল মিয়াকে বিপদে ফেলে নিজেকে রক্ষা করলো। বোতল মিয়া কারাগারে বসে নিজের কপালে করাঘাত করছিলো। আর পুলিশের হাতের চেয়েও বিপদজনক বাবার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পিনোকিও ছুটে চললো বাড়ির দিকে। যাওয়ার পথে যতোরকম দুষ্টুমি করা যায় সবই করলো সে। একদল ছাগল দেখে সে লাফিয়ে পড়লো তাদের ওপর। কারো ফুল বাগানে ঢুকে গাছগুলোর ওপর গড়াগড়ি দিলো। খাল বিল পুকুর ডোবা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল।

ঘরের দরজা ছিলো বন্ধ। পিনোকিও এমন জোরে ধাক্কা দিলো যে দরোজা খুলে একেবারে হাঁ হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে খিল এটে আরাম করে বসলো সে। হাত পা ছড়িয়ে গুনগুন করে গান ধরলো–

*লাফিয়ে চল লাফিয়ে চল*

*বাড়বে তবে পায়ের বল।*

কিন্তু বেশিক্ষণ গাইতে পারলো না সে। একে তো দৌড়ে আসার কারণে খুব ক্লান্ত লাগছিলো, তার ওপর কোথা থেকে যেন একটা ঝি...ঝি...ঝি... শব্দ ভেসে আসছিলো। সে একটু ভয়ও পেলো আবার বিরক্তও হলো। অবশ্য মেজাজ খারাপই হলো বেশি। গান গাওয়ার সময় কোনো রকম শব্দ সে সইতে পারে না। বিরক্ত হয়েই সে জিজ্ঞেস করলো :

–কে, কে আমাকে গানের সময় বিরক্ত করছো?

–আমি।

পিনোকিও এদিক সেদিক তাকালো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মস্ত বড়ো একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা চোখে পড়লো। দেয়াল বেয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছিলো পোকাটি। পিনোকিও উঠে দাঁড়ালো। একটু ধমকের সুরেই বললো :

–এই অসভ্য প্রাণী, আমাকে তোমার পরিচয় দাও।

–আমি ঝিঁ-ঝিঁ পোকা। এখানেই আমি থাকি। একশ' বছর ধরে এই ঘরে বাস করছি আমি।

–ভালো কথা। কিন্তু আর তো এখানে থাকতে পারবে না বাছাধন। এই ঘর এখন আমার দখলে। দয়া করে অন্য কোথাও গিয়ে আমাকে আপন মনে গান গাইতে দাও।

–তুমি বললে তো আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলতে চাই। একটু মনোযোগ দিয়ে তোমার শোনা উচিত।

–বলো আমি শুনছি।

–তোমার বয়স কম, তাই অনেক কিছুই তুমি বোঝো না।। যেসব ছেলেমেয়েরা বাবার কথা শোনে না, নিজের ইচ্ছেমতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলোমেলো ছোটাছুটি করে, তাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাদের শান্তি নেই।

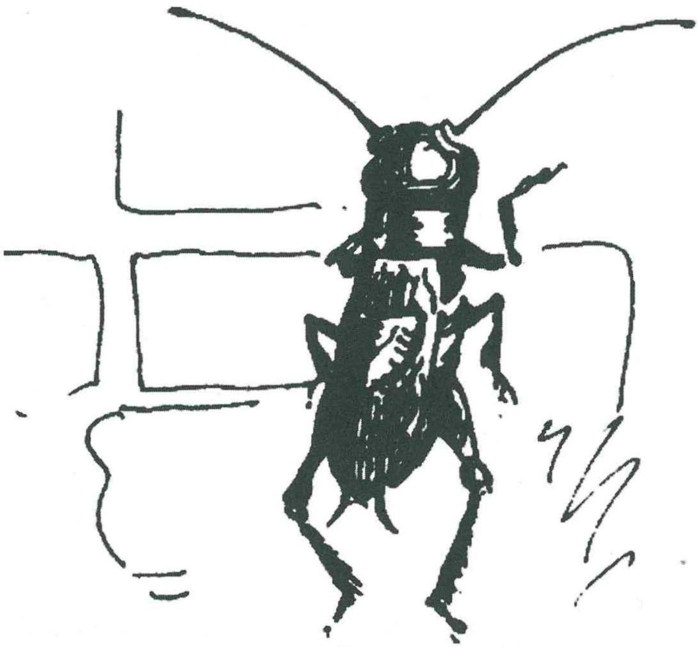

আজ হোক কাল হোক, তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

–সেটা সময় হলে দেখা যাবে, দুষ্টুমি করে কষ্ট ভোগ করতে আমার আপত্তি নেই। তুমি তোমার নিজের ভাবনা ভাবো। আগামীকাল থেকে তুমি আর এই ঘরে থাকতে পারছো না।

–কিন্তু কেনো? তোমার সঙ্গে থাকলে আমি তোমাকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবো।

–তোমার পরামর্শে আমার গায়ে জ্বালা ধরছে। তুমি এখানে থাকলে আমার দশাও আর দশটা ছেলের মতোই হবে। বই পড়ো, নিয়মিত স্কুলে যাও। নিয়ম মেনে খেতে যাও, ঘুমাতে যাও, আবার ভোরে ওঠে স্কুলের জন্য প্রস্তুতি নাও। ইস, অসহ্য। আমি তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমার ছোটাছুটি-লুটোপুটি খেতেই ভালো লাগে। আমি প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়াবো, পাখির বাসা থেকে বাচ্ছা এনে ওদের সঙ্গে খেলা করবো, আপন মনে গান গাইবো– এতেই আমার আনন্দ।

–তুমি একটা বোকা ছেলের মতো কথা বলছো দেখছি! কিচ্ছু জানো না তুমি। এরকম যারা করে, তারা আস্ত গাধা হয়ে যায়। তখন সবাই গাধার পিঠে চড়ে তোমাকে নিয়ে হাসি তামাশা করবে।

–তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো ঝিঁ-ঝিঁ পোকা। তোমার তো সাহস কম নয়, আমাকে অভিশাপ দিচ্ছো? তুমি একটা ইতর, বদমাস, বেয়াদব। তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দিবো।

ঝিঁ-ঝিঁ কিছুই মনে করলো না। ঠাণ্ডা মাথায়ই জবাব দিলো :

–যদি স্কুলে যেতে না চাও তাহলে গাধার মতোই পরিশ্রম করতে হবে। কাজ না করলে খাবে কি? শেষ পর্যন্ত না খেয়েই তোমাকে মরতে হবে। বলো তুমি কি করতে চাও?

পিনোকিও রাগে কটমট করছিলো। তবু জবাব দিলো :

–খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া কোনো কাজই আমার ভালো লাগে না। খেয়ে ঘুমাতে যাবো, ঘুম থেকে উঠে আবার খাবো, আর ইচ্ছে হলেই হৈ হুল্লোড় চিৎকার চেচামেচি করে দিন পার করে দিবো।

–তোমার কপালে কষ্ট আছে কাঠের পুতুল। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল কিংবা কারাগারই হবে তোমার ঠিকানা।

–তুমি কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করছো ঝিঁ-ঝিঁ পোকা। মাথা গরম হলে কিন্তু তোমার রক্ষা নেই।

–তোমার জন্য কষ্ট হয় পিনোকিও, বড্ড মায়া হয় আমার।

–কেনো, এতো কষ্ট ও মায়া-মমতার কারণ জানতে পারি?

–তুমি ভুলে যাচ্ছো যে তুমি একটা পুতুল! আর তোমার ঐ বিশাল ভয়ঙ্কর বিশ্রী কাঠের মাথাটা দেখলে তোমার জন্য আমার করুণা হয়।

–তবে রে বদমাশ। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

বলেই টেবিলের ওপর থেকে হাতুড়িটা নিয়ে একবারে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার গায়ে ছুঁড়ে মারলো। পিনোকিও ভাবে নি যে হাতুড়িটা সত্যি সত্যিই ঝিঁঝিঁর গায়ে লাগবে। বিশেষ করে ঝিঁ-ঝিঁর মৃত্যু হোক এটা চায় নি সে। কপাল মন্দ হলে যা হয়। লাগলো গিয়ে একেবারে মাথায়। কেবল একটা ঝি...ঝি...ঝি.. শব্দ

শোনা গেল। তারপর দেখা গেল অসহায় ঝিঁ-ঝিঁ পোকাটা দেয়ালের সাথে ঝুলছে। পিনোকিও ভাবলো :

—এ আমি কি করলাম! বেচারা মরেই গেলো! রাগের মাথায় খুব একটা খারাপ কাজ করে ফেললাম। কিন্তু আমি তো তা চাইনি!

*হাতুড়িটা ছুঁড়েছি বেখেয়ালে*
*ঝিঁঝিঁ পোকা ঝুলছে দেয়ালে?*

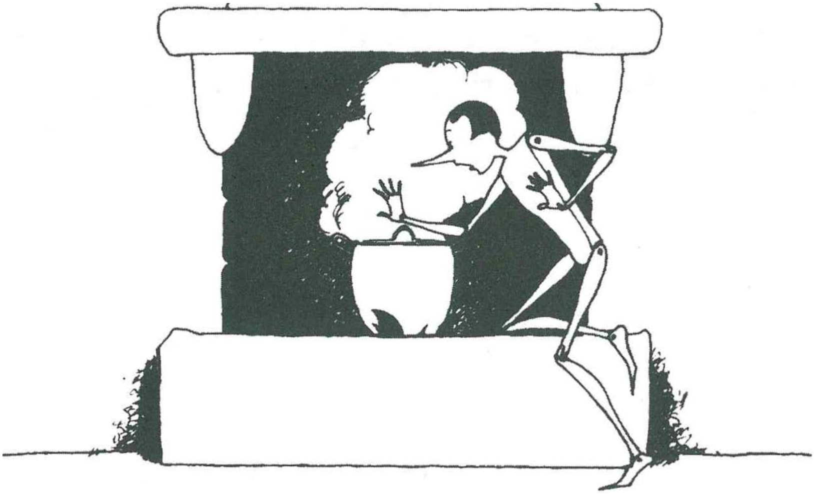

## পাঁচ

*পেটের খিদেয় কাতর হয়ে কাঁপছে পিনোকিও*
*সারা ঘরে খাবার মতো নেই তেমন কিছুও!*
*হঠাৎ করেই একটা ডিমে চোখ পড়িল তার*
*ইচ্ছে হলো সিদ্ধ করেই করবে সে সাবাড়।*
*রান্না ঘরে গেল যখন দারুণ ক্ষুধার জ্বালায়*
*ডিম থেকে বাচ্চা হয়ে জানলা দিয়ে পালায়!*

ততোক্ষণে রাত নেমে এসেছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয় নি। পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। তোমরা তো জানোই বন্ধুরা ক্ষুধা লাগলে তোমাদের কেমন লাগে। পিনোকিও-র ইচ্ছে করছিলো, ঘরের চেয়ার টেবিল হাড়ি পাতিল সবকিছু খেয়ে ফেলে। কথায় বলে না, ক্ষুধার জ্বালা বড়ো জ্বালা।

সময় যতোই পার হচ্ছে খিদের মাত্রা বেড়েই চলছে। অবস্থা এমন হলো যে পেটের ভেতর আগুন জ্বললেও দুচোখে সে অন্ধকার দেখতে লাগলো। পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে না তো!

'কি করি' ভাবতে ভাবতে পিনোকিও চুলোর কাছে গেল । গিয়েই বড়ো রকমের একটা ধাক্কা খেলো সে । চুলোয় হাঁড়ি চাপানো । ভিতরে কি আছে দেখার জন্য ঢাকনি তুলতে গিয়েই ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে গেল । কি করে পারবে বলো? সে তো আর আসল চুলো নয় । সে তো ছবি । তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বোতল মিয়ার ঘরের দেয়ালের গায়ে একটি জ্বলন্ত চুলোর ছবি এঁকে রাখা হয়েছে ।

কষ্টে দুঃখে অভিমানে পিনোকিও-র লম্বা নাক আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেল । একটু খাবারের জন্য সে কি হাহাকার । সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো । না, কোথাও কিছুই নেই । খিদে তো বেড়েই চললো । ক্ষুধার জ্বালা এমন ভয়ঙ্কর তা তো আর তার জানা ছিলো না । বারবার হাই তুলছিলো সে । শরীরের বিভিন্ন অংশ যেন খুলে যেতে চাইছিলো । খিদের কষ্ট ভুলে থাকার জন্য একটু গুনগুন করে গান গাওয়ার চেষ্টা করলো সে–

*বাগানে কতো ফুল নদীতে কতো জল*
*আজ প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে চল*
*ঐ ঢেউয়ের পিঠে বসে ভেসে ভেসে চল ।*

কিন্তু গলা শুকিয়ে তো কাঠ হয়ে গেছে । খুবই বেসুরো শোনাচ্ছিলো । শুকনো গলায় গান গাইতে গিয়ে কাশি এলো । আবার হাই তুলে থুতু ফেললো, কিন্তু মনে হলো ভেতর থেকে কেবল বাতাসই বের হলো । খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো । চুপি চুপি একটু কেঁদেও নিলো । কাঁদতে গিয়ে লক্ষ করলো, চোখ দিয়ে একটুও পানি বের হচ্ছে না । এবার নিজের মনে নানা রকম চিন্তা করতে শুরু করলো । বিশেষ করে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার কথাগুলোই বেশি করে মনে পড়লো তার ।

–ঝিঁ-ঝিঁ পোকার সঙ্গে এমন বাজে ব্যবহার করা উচিত হয় নি । ঠিকই তো বলেছিলো সে । বাবার কথা না শুনে পথে বের হয়ে খুবই অন্যায় করেছি । তারপর মিথ্যে অভিনয় করে বাবাকে কারাগারে পাঠানোটা ভারি অন্যায় হয়েছে । বাবা এখানে থাকলে তো আর আমাকে না খেয়ে মরতে হতো না । খিদের মতো এমন বাজে রোগ আর হয় না ।

পিনোকিও আবার সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলো । টেবিলের উপরে, নিচে, ড্রয়ারে, ঘরের আনাচে কানাচে খাবার খুঁজতে লাগল সে । খুঁজতে খুঁজতে ঘরের একপাশে জমিয়ে রাখা ময়লার গাদার মধ্যে সাদা সাদা গোলাকৃতি একটা

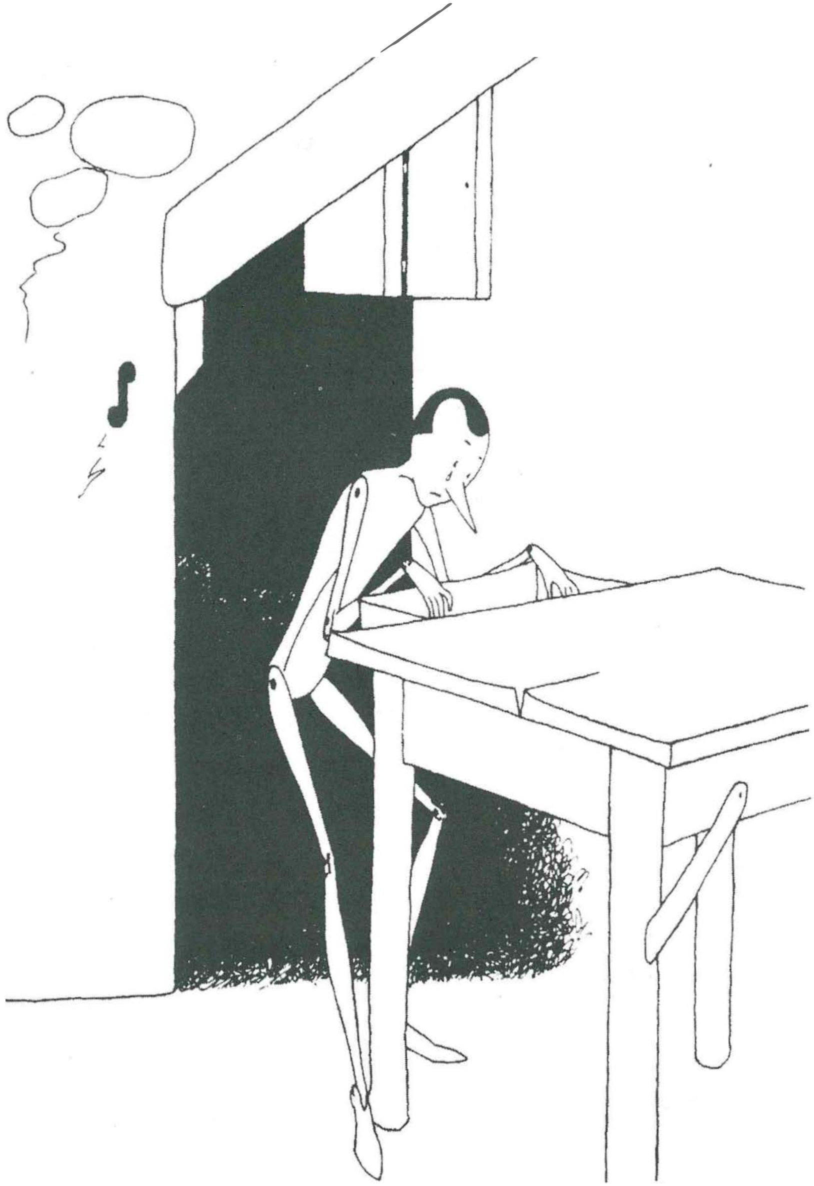

জিনিস চোখে পড়লো তার। দেখতে বেশ বড়ো বলেই পিনোকিও ভাবলো এটা হয়তো ঘোড়ার ডিম হবে। যার ডিমই হোক না কেন ওটা দিয়েই পেটের আগুন নেভাতে হবে। আনন্দে আবার গান গাইতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু শরীরে শক্তি পেলো না। ডিমটা হাতে নিয়ে কয়েক পাক নেচে নিলো। ওটার গায়ে আদর বুলাতে বুলাতে কয়েকবার চুমোও খেলো। নিজে নিজেই ভাবতে লাগলো :

–কিভাবে খেলে সবচেয়ে বেশি মজা পাওয়া যাবে? ওমলেট, মামলেট, বয়েল, হাফ বয়েল, নাকি ফ্রাই? ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে হলো, সময় নেই। এটাকে বরং কাচাই খাওয়া যাক। আবার মনে করলো : দরকার নেই। কাঁচা খেলে পেটে অসুখ হতে পারে। বরং সিদ্ধ করে পটাপট খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে ফেলি। মনে হলো এতে সময় বেশি লাগবে। সিদ্ধান্ত নিলো, কড়াইতে নিয়ে ভেজে ঝটপট খেয়ে ফেলি। কড়াইটা চুলোয় দিয়ে আরেক ঝামেলায় পড়লো। ঘরে তো তেল ঘি কিছুই নেই। কি আর করা। কড়াইয়ের ভেতর সে ঢেলে দিলো সামান্য পানি। ছ্যাৎ করে একটা শব্দ হলো। এবার ডিমের খোসা ছাড়ানো শুরু করলো সে। ঘোসা ছাড়িয়ে ভিতরের অংশটুকু কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দিতেই সেই কুসুম থেকে একটা চমৎকার ফুটফুটে মুরগির বাচ্চা বেরিয়ে এলো।

পিনোকিও-কে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো :

–আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা । আপনি আমাকে খোসা ছাড়ানোর ঝামেলা থেকে বাঁচালেন। এবার আমায় বিদায় দিন। যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন।

বলেই ফুরুৎ করে উড়াল দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। পিনোকিও বোকার মতো সেই দিকে তাকিয়ে রইলো।

বন্ধুরা তোমরা কি বলো? অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার তাই না? বেচারা পুতুলের অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখো। তার হাতে তখনো সেই ডিমের খোসা।

পিনোকিও বিস্ময়ে এবং খিদের জ্বালায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। কতোক্ষণ এভাবে ছিলো বলতে পারি না। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আবার হায় হায় শুরু করলো সে। কাঠের পুতুলের মনে তখন অনুশোচনা জাগলো। নিজের মনেই উচ্চারণ করলো :

*ধিক ধিক শতো ধিক*
*ঝিঁ-ঝিঁ'র কথাই ঠিক ।*
*এখন আমি করবো কি?*
*খিদেয় জ্বালায় মরবো কি?*

এবার চিন্তা করলো, ঘরে বসে থাকা ঠিক হবে না । বাঁচার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে । মানুষের কাছে হাত পাতলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে । এবার খুঁজতে হবে কাছাকাছি বাড়ি কোথায় আছে । ভালো মানুষের কাছে গেলে বাঁচার একটা উপায় হতে পারে । চেয়ে চিন্তে খেয়ে আগে তো নিজের জানটা বাঁচানো দরকার । বাবার অবস্থা যে এখন কী তাও মনে পড়লো তার । কিন্তু সেদিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারলো না । কারণ, তোমরা তো জানোই : নিজে বাঁচলে বাপের নাম ।

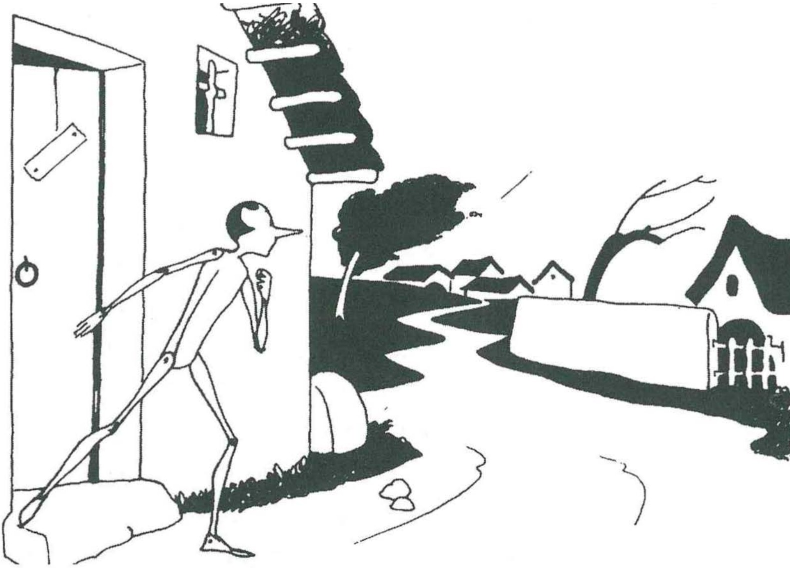

## ছয়

*বাঁচার জন্য করতে গিয়ে ভিক্ষা*
*পিনোকিও-র হলো কঠিন শিক্ষা।*
*ঘুমের ভেতর এলিয়ে দিলো গা*
*জেগে দেখলো : পুড়েছে দুই পা।*

বন্ধুরা, ভয়াবহ সেই রাতের কথা তোমাদের বলে বোঝানো যাবে না। কেবল নরকের সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ ডাকছিলো গ্রুম গ্রুম করে। এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো যেন আকাশ চিড়ে যাবে। শোঁ শোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো। আর ধুলোর দাপট চোখ খুলে দেখার উপায় ছিলো না। বাতাসের ধাক্কায় গাছগুলো বারবার মাটিতে নুয়ে পড়ছিলো। পিনোকিও-র ভয় হচ্ছিলো যদি বজ্রপাত হয়। বিদ্যুতের চমকে পিলে চম্‌কে যাচ্ছিলো তার। কিন্তু খিদের ব্যাপারটা সে ভুলে থাকতে পারছিলো না। সাহস করে দরোজা খুলে বাইরে বের হলো। সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো কুকুরের মতো করে। তোমরা শুনে হয়তো অবাক হবে যে, তার জিভটাও ক্লান্ত কুকুরের জিভের মতোই অনেকখানি বাইরে বের হয়ে

এসেছিলো। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে হয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলো :

*তানা তানা তর্ তর্*
*থেমে যা বৃষ্টি ঝড়*
*তিল্-তিল্ তিল্-তুলো*
*থাম বজ্র থাম ধুলো*

কিন্তু মন্ত্রে কোনো কাজ হলো না। যতোদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার আর মরুভূমি। কিছুই চোখে পড়ে না। বাড়িঘর দোকানপাট দুয়েকটা যা আছে তাও বন্ধ। জীবিত একটা বাঘের দেখা পেলেও মনে একটু বল আসতো। এ কোন মরার দেশে সে এসেছে পড়েছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। অবশেষে একটা বাড়ি চোখে পড়লো তার। সাহস করে দরোজায় এসে আঘাত করলো। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার বেশ জোরের সঙ্গেই করাঘাত করলো। এবার এ বাড়িতে জীবিত কেউ থাকলে নিশ্চয়ই আসবে। দরোজা খুললো না। জানালা দিয়ে এক বুড়ো উঁকি দিলো। রাগে তার চেহারা অনেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। বন্ধুরা, তোমরা তো জানো রাগ করলে মানুষের চেহারা খুব বিশ্রী হয়ে যায়। পিনোকিও দেখলো বুড়ো খুব উচু গলায় পিনোকিও-কে বলছে :

–কে তুমি ছোকরা? এই ঝড়বাদলের রাতে কি চাও শুনি?

–আমি অসহায়, আমি ক্ষুধার্ত। দয়া করে আমাকে কিছু খাবার দিতে পারেন?

চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো বৃদ্ধ। চোখ তো নয়, যেন আগুনের গোলা। পিনোকিও-র বুকটা কেমন করে উঠলো। তারপর বললো :

–একটু দাঁড়াও।

বলেই বৃদ্ধ ভেতরে চলে গেল। বুড়োর মনে হলো এ কোনো বদমাশ ছেলে হবে। অসময়ে অযথা বিরক্ত করতে এসেছে। এর একটা ভালো শিক্ষা হওয়া উচিত।

অনেকক্ষণ বুড়োর কোনো দেখা নেই। পিনোকিও-র তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এক সময় জানালা খুলে গেল। সেই বুড়োর গলা। চিৎকার করে বলছে :

–এখনো দাঁড়িয়ে আছো দেখছি। আরেকটু এদিকে এগিয়ে এসো। হ্যা ঠিক আছে। এবার তোমার টুপিটা উল্টো করে ধরো।

আনন্দে পিনোকিও-র বুকটা ভরে গেল। কাছে এগিয়ে গেল সে। মেলে ধরলো মাথার টুপি। কিন্তু হতভাগার যা কপালে থাকে। তোমরা তো শুনেছো যে–

*অভাগা যেদিকে চায়*
*সাগর শুকিয়ে যায়।*

টুপি উল্টো করে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক বালতি পানি ঝপাৎ করে তার গায়ে এসে পড়লো। সারা শরীর ভিজে একাকার।

পিনোকিও-র তখন চোখ ফেটে জল আসছিলো। বেচারা কি বিপদেই না পড়েছে। ভেজা বেড়ালের মতো কোনো রকমে ঘরে ফিরে গেল সে। দেহে মনে ক্লান্তি নেমে এলো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। টলতে টলতে চুলোর কাছে গিয়ে বসলো। চুলোর আগুনে নিজেকে গরম করতে লাগলো। কিন্তু চোখ খোলা রাখতে পারলো না। এক সময় জ্বলন্ত চুলোর পাশেই ঘুমিয়ে পড়লো পিনোকিও। সে কি গভীর ঘুম। ঘুমাতে ঘুমাতে স্বপ্ন দেখলো : এক রাজবাড়িতে ভোজসভায় যোগ দিয়েছে সে। হরেক রকম খাবার। যতোই খাচ্ছে ততোই খাবার এসে তার সামনে হাজির হচ্ছে। খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তার সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। পাশেই কাবাব তৈরি হচ্ছে আর সেই কাবাব এসে তার থালায় জমা হচ্ছে। কাবাবের গন্ধে সারা ঘর মৌ মৌ করছে। কাবাবের গন্ধের সঙ্গে চুলোর কাঠের গন্ধ মিলে পুরো ভোজসভা স্বর্গের সুগন্ধিতে ভরে যাচ্ছে।

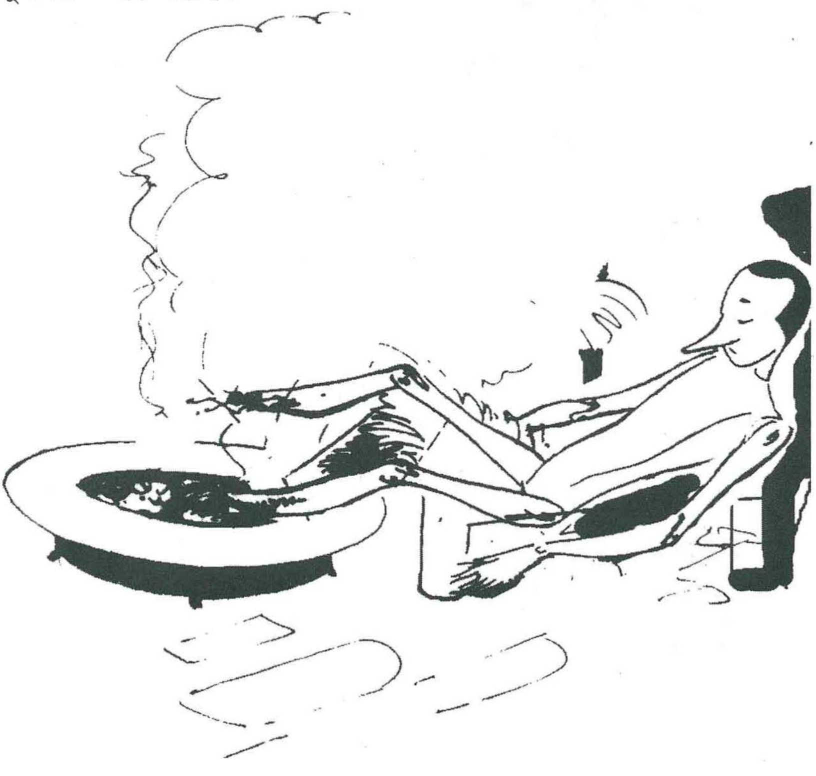

কিন্তু আসল ঘটনা খুবই ভয়াবহ। কোনো স্বর্গের ব্যাপার স্যাপার নেই। ঘুমের মধ্যেই পিনোকিও-র কাঠের পায়ে আগুন ধরে গেছে। দুটো পা-ই পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন কেবল ছাই হবার অপেক্ষা। পিনোকিও তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন নিজের পায়ে আগুন দিয়ে নিজেকে গরম করে নিচ্ছে সে। অথবা যে পা দুটো আগুনে পুড়ছে তা পিনোকিও-র পা নয়, অন্য কারো হবে হয়তো।

ততোক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। দরোজায় ধরাম্ ধরাম্ শব্দ হলো। ধরমর করে জেগে উঠলো পিনোকিও। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে শুনতে পেলো :

–পিনোকিও দরোজা খোলো। সেই কখোন সকাল হয়েছে।

–কে? চোখ মুছতে মুছতে হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলো।

–আমি।

গম্ভীর এবং বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো একজন।

পিনোকিও বুঝতে পারলো এটা তার বাবা বোতল মিয়ার গলা।

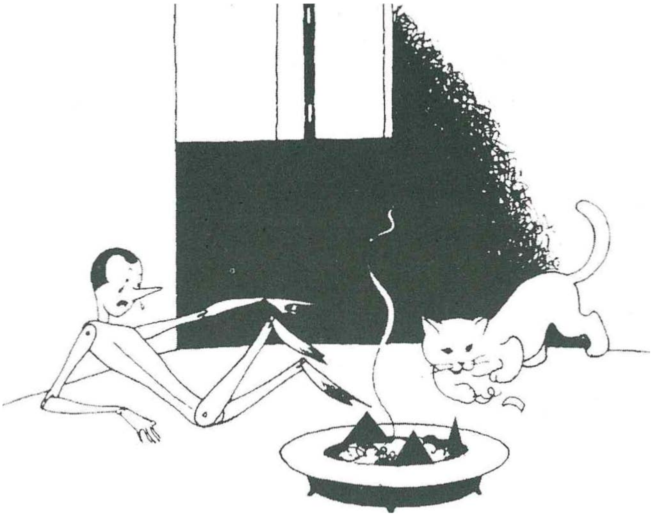

## সাত

*ঘরে ফিরে বোতল মিয়ার চোখে পড়ে যা*
*পিনোকিও-র সবই আছে নেই কেবল পা।*
*সবকিছু জেনে শুনে রাগ গেল তার ঝরে*
*নিজের খাবার ওকে দিয়ে নতুন পা গড়ে।*

বাবার গলা শুনে পিনোকিও লাফিয়ে উঠে দরোজা খুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই দরোজার কাছে পৌঁছুতে পারলো না। তার পা যে পুড়ে গেছে সেই দিকে খেয়ালই করে নি সে। একে তো চোখের ঘুম পুরোপুরি কাটেনি, তার ওপর পা নেই। ফলে দরোজার দিকে এগুতে গিয়ে কয়েকবার টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল। এদিকে কারাগার থেকে ফিরে ক্লান্ত বোতল মিয়া দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো :

—আমার কথা কানে যাচ্ছে না? তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে দাও।

—আমি তো চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না বাবা।

কাঠের পুতুল কান্নাকাটি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জবাব দিচ্ছে কিন্তু বোতল মিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মেজাজ আরো গরম হয়ে যাচ্ছে। রাগে তার কপাল ফেটে আগুন বের হচ্ছে যেন।

–আর বদমায়েশি করো না বলছি। কি হয়েছে তোমার? কেনো পারছো না?

–কে যেন আমার পা খেয়ে ফেলেছে বাবা। আমি কিছুতেই দরোজার কাছে যেতে পারছি না।

–কি পাগলের মতো কথা বলছো? কে তোমার পা খেয়ে ফেলেছে?

–হাতের কাছে একটা বিড়াল দেখে পিনোকিও-র মনে হলো এটা এই বিড়ালেরই কাজ হবে। সে জবাব দিলো :

–একটা বদমাশ বিড়াল।

–দরোজা খুলে দাও। এখন দুষ্টুমির সময় নয়।

বোতল মিয়া রাগে গজগজ করতে করতে বললো। বিড়ালের অজুহাত দেখানোয় তার মেজাজ আরো গরম হয়ে গেল।

–এখন দরোজা না খুললে কিন্তু খুনাখুনি হয়ে যাবে বলছি। তোমাকে বিড়ালের মাংশ দিয়ে কাবাব বানিয়ে খাওয়াবো।

–বিশ্বাস করেন বাবা। আমি তো দাঁড়াতে পারছি না। আমি বুঝি সারাজীবন খোড়া হয়েই থাকবো। আমার এখন কি হবে গো। আমি তো আর দৌড়াতে পারবো না। সারাটা জীবন এভাবে হাঁটু দিয়ে হাঁটতে হবে।

বোতল মিয়ার তো এসব কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ভাবলো : পুতুলের অমন করে কান্নাকাটি তার দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে খুব কষ্ট করে জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

পিনোকিও-কে দেখে সে একেবারে থ হয়ে গেল। একি কাণ্ড! এই ভয়ানক অবস্থা দেখে বোতল মিয়ার রাগ একদম মাটি হয়ে গেল। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। পিনোকিও-র কষ্টও যেন শতগুণ বেড়ে গেল। সে শিশুর মতো বাবার বুকে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। এভাবে দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটির পর দুজনেই শান্ত হয়ে বসলো। পিনোকিও-কে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো। আদর করে বুকে টেনে নিয়ে বারবার কপালে মুখে চুমু দিতে লাগলো।

–সোনা আমার, মানিক আমার। কেমন করে তুমি তোমার পা পুড়ালে বাবা?

–আমি কিছুই বলতে পারবো না বাবা। কাল রাত আমার কিভাবে কেটেছে তা আমি কিছুতেই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

তারপর একে একে বাবার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পর ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। ঝিঁঝি পোকার কথা, খিদের যন্ত্রণায় ছটফট করার কথা, ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বের হওয়ার কথা, খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে ভিজে কাকের ছাও হয়ে ঘরে ফেরার কথা, চুলোর পাশে ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলতে লাগলো। কথা বলতে বলতে বারবার চোখের পানি মুছলো পিনোকিও। সে কি কান্না! যেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকেও সেই কান্নার সুর শোনা যাবে।

সব শুনে বোতল মিয়া তো হতবাক। অবশ্য এর অনেক কিছুই সে বুঝে উঠছিলো না। পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছিলো বোতল মিয়ার। এসব ভেবে সময় নষ্ট করতে চাইলো না সে। কারণ সে শুনেছে দুদিন তার সোনার টুকরো ছেলে কিছুই খায় নি। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কয়েকটি নাশপাতি বের করে

পুতুল সোনার হাতে দিয়ে বললো :

–এইটুকু খেয়ে নাও বাবা। আমি নিজের জন্য এগুলো এনেছিলাম। কিন্তু তোমার কষ্টের কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমার জন্য বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে বাবা। আমি খুশি হয়েই আমার নাস্তা তোমাকে দিলাম। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন।

–আমি আপনার নাস্তা খেলে আপনি কী খাবেন? আর আমি খাবো কি করে? আমি তো খোসা ছাড়াতে পারবো না। দয়া করে এই নাশপাতিগুলোর খোসা ছাড়িয়ে দিন।

–এতো কষ্ট করার পরও তোমার বেয়াদবি দূর হলো না। তুমি আমাকে বলছ খোসা ছাড়িয়ে দিতে? আর খোসা ছাড়ানোর কথা ভাবছো-ই বা কেনো? কোনো খাবারই অবহেলার নয়। এগুলো খোসাসহ খাও। পৃথিবী বড়ো কষ্টের জায়গা বাবা। জীবনে কখন কষ্ট নেমে আসবে তা কেউ বলতে পারে না।

–আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু খোসাশুদ্ধ ফল খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওতে আমার নির্ঘাৎ পেটের অসুখ হবে।

পিনোকিও-র কথায় বোতল মিয়ার মেজাজ খারাপ হলেও নাশপাতিগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ছেলের হাতে দিলো।

পিনোকিও রাক্ষসের মতো নাশপাতিগুলো গিলতে শুরু করলো। খেতে খেতে বিচিগুলো ফেলে দিতে গেলে বোতল মিয়া বললো :

–এ তুমি কী করছো? বিচিগুলো ফেলো না। ওগুলো খেয়ে ফেলো।

একথা শুনে পিনোকিও-র খুব হাসি পেলো। মনে মনে বললো : বাবাটা যা কৃপণ। এমন কৃপণের ঘরেই শেষ পর্যন্ত আমার ঠাঁই হলো। আমার কপালে কী যে আছে বলা যায় না। সবগুলো নাশপাতি খাওয়ার পর সে বাবার কাছে আরো খাবার চাইলো। কারণ এটুকু খাবার তো তার পেটের এক কোণায় পড়ে রইলো। পুরো পেটটাই তো প্রায় খালি। কিন্তু আর কোনো খাবার তো বাবার কাছে নেই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত খেতে খেতে সে ফেলে দেয়া খোসা বিচি সবই খেয়ে ফেললো। কথায় বলে না, বিপদে পড়লে বাঘে ধান খায়।

পিনোকিও-র খাওয়া দেখে বাবার খুব হাসি পেলো। পুতুল সোনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললো :

–দেখেছো তো বাবা, পৃথিবীর কোনো কিছুই ফেলনা নয়। বিপদের সময় সবকিছুই কাজে লাগে।

পিনোকিও কিছুই বললো না। কেবল বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। খেয়ে এবার গায়ে একটু শক্তি ফিরে আসায় সে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলো :

*যা পাবো সব খাবো ফেলবো না কিছু*
*পাহাড় সাগর খাবো উচু আর নিচু*
*চাল খাবো কাঠ খাবো কচু আর ঘেচু।*

গান যেন আর থামতেই চায় না। বোতল মিয়া হাসতে হাসতে আদরের দুষ্টু ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো :

–আবার দুষ্টুমি হচ্ছে? এতো কষ্ট করেও দেখছি তোমার শিক্ষা হলো না। তোমাকে যে কিভাবে মানুষ করবো তাই ভাবছি।

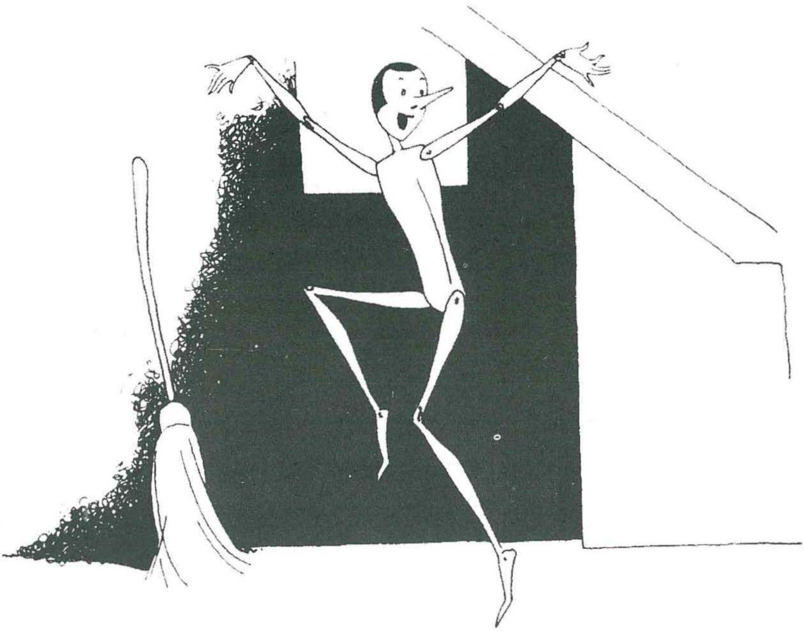

## আট

*নতুন করে তৈরি হলো পিনোকিও-র পা*
*কথা দিলো যখন তখন বাইরে যাবে না ।*
*বোতল মিয়া গরিব মানুষ পেটে খিদের জ্বালা*
*কোট বেচে সে ছেলের জন্য কিনলো বর্ণমালা ।*

দুইদিন খিদের কষ্ট সহ্য করে পেটে যখন কিছু পড়লো তখন তার নানা রকম বায়না শুরু হলো । তার প্রথম চাওয়া হলো : নতুন করে পা তৈরি করে দিতে হবে ।

বোতল মিয়া কিন্তু সহজে রাজি হলো না । পুতলটা এমন বদমাশ আর পাজি যে এর একটা শিক্ষা হওয়া উচিত । দুদিন কষ্ট করুক । তারপর ভেবেচিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবে । বেশ উচু গলায় চোখ বড়ো বড়ো করে বললো :

–যতোই কান্নাকাটি করো, তোমার পা আমি তৈরি করছি না । তুমি যে কষ্ট আমাকে দিয়েছো । শেষ পর্যন্ত এই বুড়ো বাপকে তুমি জেলের ভাত খাইয়ে

ছেড়েছো।

পিনোকিও কিন্তু অনুনয় বিনয় করতেই লাগলো। অবশেষে বাবার হাত ধরে শপথ করে বললো :

–এই আপনাকে ছুঁয়ে দিব্যি করছি– এখন থেকে আর দুষ্টুমি করবো না। আপনার কথামতো চলবো। দেখবেন বাবা, আমি আপনার শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে হয়ে যাবো।

বোতল মিয়ার মন ভিজল না। ছেলের কথায় এতো তাড়াতাড়ি দুর্বল হলে চলবে না। ওর আরো একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। তাই অন্য দিকে তাকিয়ে বললো :

–কাজ বা দাবি আদায় করার জন্য তোমার মতো সব ছেলেমেয়েই এমন সুন্দর সুন্দর মিষ্টি কথা বলে। কাজ শেষে এসব কিছুই মনে থাকে না।

–আমাকে বিশ্বাস করেন বাবা। আজ থেকে সব দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে লেখাপড়ায় মন দেবো–

*দুষ্টুমি করবো না*
*বিপদে পড়বো না।*
*লেখাপড়া করবো*
*নিজের জীবন গড়বো।*

–বোতল মিয়া মনে মনে ছেলের কথা শুনে খুশিই হলো। বিশেষ করে পুতুলের কবিত্ব তার খুব ভালো লাগলো। বড়ো হলে তার পুতুল সোনা নিশ্চয়ই নামকরা কবি হবে। পিনোকিও-র এমন কান্না কান্না অবস্থা দেখে বাবার মনটা গলে গেল। চোখে জল এলো। আদর করে বুকে জড়িয়ে নিলো। আর কথা বাড়ালো না সে। হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে কাজে লেগে গেল। তার প্রিয় ছেলের জন্য পা তৈরি করতে শুরু করলো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পা তৈরির কাজ শেষ হলো। পা দুটো একটু ছোটো হয়ে গেল মনে হয়। তবে খুব সুন্দর, শক্ত এবং সুঠাম হয়েছে। নিজেই নিজের কাজের প্রশংসা না করে পারলো না। বোতল মিয়া এবার পুতুল সোনাকে বললো :

–এবার একটু চোখ বন্ধ করো তো সোনামণি!

পিনোকিও চোখ বন্ধ করার ভান করলো। এই অবসরে বোতল মিয়া আঠা দিয়ে শক্ত করে তার পা দুটো জায়গামতো লাগিয়ে দিলো। কাঠের পুতুল সবকিছু টের পেলেও তখন কিছুই বললো না। বোতল মিয়া যখন বললো :

–এবার চোখ খোলো তো সোনামণি!

চোখ খুলেই নিজের নতুন পা দুটি নেড়েচেড়ে দেখে আনন্দে লাফাতে শুরু করলো। নাচতে নাচতে সারা ঘর মাথায় তুললো। কয়েকবার ডিগবাজিও খেলো। নাচতে নাচতে বলতে লাগলো :

*তাইরে নাইরে না*
*পেলাম নতুন পা*
*মনের সুখে ঘুরবো সারা গাঁ।*

বাবাকে জড়িয়ে ধরে তার ঘামে ভেজা কপালে চুমু খেলো। বাবার হাত ধরে তাকে নিয়েও একটু নাচলো সে। আনন্দে গদগদ হয়ে বাবাকে বললো :

–নতুন পা পেয়ে আমি খুবই খুশি। আপনি আমার খুব ভালো বাবা। এখন থেকে লেখাপড়ায় মন দিতে চাই। আগামীকাল থেকেই আমি স্কুলে যেতে চাই।

–এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা।

–কিন্তু স্কুলে যেতে হলে তো বই খাতা কলম এবং নতুন জামাকাপড় চাই।

বোতল মিয়া গরীব মানুষ। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তাই ছেলের কথায় মনটা ভারি হয়ে গেল। ছেলেকে খুশি করার জন্য হাতের কাছে যে কাগজ ছিলো তাই দিয়েই একটা পোশাক তৈরি করে দিলো। জুতা বানালো গাছের ছাল দিয়ে।

আর আটার মণ্ড দিয়ে তৈরি করলো পুতুল সোনার টুপি। তাতেই পিনোকিও-র খুশি যেন আর ধরে না। কাগজ আর গাছের ছালের পোশাকেই নিজেকে সাহেব মনে হলো তার। কিন্তু বোতল মিয়া তাকে আদর করে বুঝিয়ে বললো : সুন্দর পোশাক পরলেই সাহেব হওয়া যায় না। পোশাকে সুন্দর হলে তাকে ভালো মানুষও বলা যায় না। মানুষের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার কাজকর্ম আচার-আচরণের ওপর।

পুতুল সোনা বাবাকে আবার মনে করিয়ে দিলো যে সে স্কুলে যেতে চায়। এর জন্য তার অনেক কিছু প্রয়োজন :

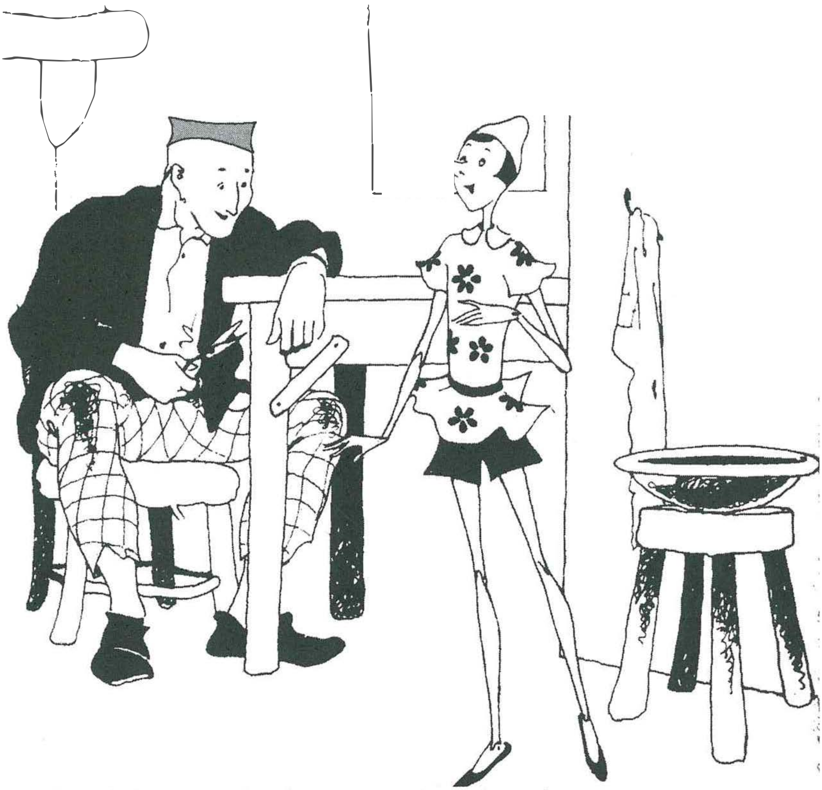

–বাবা, আমার স্কুলে যাওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা করো।

–কি করতে হবে বলো।

–অনেক কিছু চাই আমার।

–বলো তোমার কি কি চাই।

–সুন্দর পোশাক এবং বর্ণমালা শেখার বই।

*অ আ ক খ*
*বই পড়ে মানুষ হ*
*সুন্দর পোশাক পড়ো*
*স্কুলের পথ ধরো*

বোতল মিয়ার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সুন্দর পোশাকের জন্য অনেক টাকার

দরকার। পকেট ফাঁকা। পোশাকের কথা না হয় একটু পরে ভাবা যাবে। কিন্তু বই না হলে তো আর স্কুলে যাওয়া যায় না। তাই মন খারাপ করেই ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো :

–বই কোথায় পাওয়া যাবে?

–বইয়ের দোকানে।

–টাকা আসবে কোথা থেকে?

–তা তো জানি না বাবা।

–আমার কাছে তো কোনো পয়সা কড়ি নেই।

কাঠের পুতুল কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। বাবা বললেন :

–দেখি কি করা যায়।

বলেই ছেঁড়া কোটটা গায়ে জড়িয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। ঘণ্টাদুয়েক পর যখন বাড়ি ফিরল তখন তার হাতে পুতুল সোনার জন্য একখানা বর্ণমালা। কিন্তু তার গায়ের ছেঁড়া কোটটি আর দেখা গেল না।

ছোট্ট সোনামণিরা। তোমরা একটু ভেবে দেখো, সন্তানের জন্য বাবার কি মায়া। দারুণ শীতের মধ্যে নিজের একমাত্র কোটটা বিক্রি করে বই কিনলো বোতল মিয়া। ছেলেকে মানুষ করতে অনেক বাবা-মাকেই এভাবে কষ্ট করতে হয়।

পিনোকিও-র খুব মায়া হলো বাবার জন্য। বাবা তাকে কতো ভালোবাসে। এই শীতে তাকে কতো কষ্ট করতে হবে। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করলো বাবাকে সে আর কষ্ট দিবে না। সব সময় বাবার কথামতো চলবে। মন দিয়ে পড়ালেখা করবে। সত্যিকারের মানুষ হয়ে একদিন বাবার মুখে হাসি ফুটাবে। তার চোখ ফেটে জল এলো। বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বললো :

*আমার বাবা সবচে' ভালো*
*বাবার মুখ করবো আলো।*

## নয়

*বর্ণমালা হাতে নিয়ে বের হয়েছে পিনোকিও*
*লেখাপড়া শিখে এবার মানুষ হবে পুতুলটিও।*
*বাবার স্বপ্ন পূরণ হবে শপথ করে সকাল বেলা*
*বর্ণমালা বিক্রি করে দেখে এলো পুতুল খেলা।*

বাইরে বেশ মিষ্টি হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীত প্রায় বিদায় নিয়েছে। আবার গরমও পড়তে শুরু করে নি। এমনই এক চমৎকার সকালে পিনোকিও বর্ণমালা হাতে স্কুলের পথে পা বাড়ালো। যেতে যেতে কতো সুন্দর সুন্দর চিন্তা করলো সে। তাকে মানুষ হতে হবে। বাবার কষ্টের কথাই বারবার মনে পড়ছিলো তার। বুড়ো বয়সে বাবাকে আর পরিশ্রম করতে দেবে না সে। বাবা তাকে কতো ভালোবাসে। এই ভালোবাসার সঙ্গে আর বদমায়েশি করা ঠিক হবে না। ভালো ছেলে হিসেবে সে বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে।

পড়াশোনায় ফাঁকি দেবে না সে। প্রথম দিনেই সবগুলো অক্ষর শিখে ফেলতে হবে। পরের দিন শিখতে হবে অংক করা। একদিন অনেক টাকা হবে তার। প্রথম রোজগারের টাকা দিয়ে সে বাবার জন্য একটা উলের কোট কিনবে। যে বাবা নিজের ছেলের জন্য গায়ের একমাত্র কোট বিক্রি করে দেয় তার জন্য উলের কেনো, রূপোর বা সোনার কোট কিনে দিলেও তো এ ঋণ শোধ হবে

না। কোটের বোতামগুলো কেমন হবে তাও ঠিক করে ফেললো সে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সে স্কুলের পথে এগুচ্ছিলো। হঠাৎ করেই তার কানে এলো নানা রকম বাজনার শব্দ। একতারা দোতারা ঢোল খোল খঞ্জনি জিপসি বাঁশি আরো কতো কি যে একসাথে বেজে চলছে। এক নিমেষে মাথার সব ভাবনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কি চমৎকার শব্দই না ভেসে আসছে। প্যা-প্যা-প্যা ট্যা-ট্যা-ট্যাং তাকঢুম-তাকঢুম তাইরে-নাইরে না আরো কতো রকমের বাজনা বাজছে।

হঠাৎ পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল পিনোকিও। রাস্তার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে এই মনোরম শব্দ। গাছপালা ঘেরা একটা ছোট্ট গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা নদীর দিকে চলে গেছে সেই দিক থেকেই তো শব্দ আসছে বলে মনে হয়। স্কুলে যাওয়ার রাস্তার ঠিক উল্টো দিক থেকে। পা কিছুতেই চলছে না। কান খাড়া করে ভাবতে লাগলো পিনোকিও :

–এমন মধুর সুর তো কোনোদিন শুনি নাই। কপাল মন্দ। নইলে কি আর স্কুলের যাওয়ার সময়ই এমন গানবাজনা হয়! স্কুলের সময় না হলে তো নদীর তীরে কি হচ্ছে দেখে আসতে পারতাম।

কি করবে কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না সে। বাজনা শুনতে গেলে স্কুলে যাওয়া হয় না। আবার স্কুলে গেলে এমন মজার জিনিসটা তার দেখা হয় না। দোটানায় পড়ে গেল পিনোকিও। একবার ভাবে, এসব চিন্তা করলে চলবে না। তাকে স্কুলেই যেতে হবে। আবার ভাবে, স্কুলে তো আগামীকালও যেতে পারবে কিন্তু এই মজাটা তো আর পরে পাওয়া যাবে না।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো সে নদীর তীরের দিকেই হাঁটবে। হাঁটা তো নয় যেন ছুটে চললো সে। যতোই সে নদীর কাছাকাছি হচ্ছিলো বাজনার শব্দ ততো পরিষ্কার হচ্ছিলো। আহা! এমন মধুর হতে পারে বাজনা : প্যা-প্যা-প্যা ট্যা-ট্যা-ট্যাং তাকঢুম-তাকঢুম তাইরে-নাইরে...

এক দৌড়ে সে নদীর পাড়ে এসে পৌঁছালো। হাজার হাজার মানুষ। পুরো মাঠে পা ফেলবার জায়গা যেন নেই। সবাই একটা সাজানো ঘরের দিকে ছুটছে। পিনোকিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। কী হচ্ছে এখানে? কারো কাছে জিজ্ঞেস করলে হয়। খুব ভয় পাচ্ছিলো সে। কার কাছে জানতে চাইবে? যদি

সে কিছু মনে করে? কিংবা যদি ধমক দিয়ে বলে : এই পুচকে ছেলে, তুমি এখানে এসেছো কেনো?

কাছেই একটা ছোট্ট ছেলেকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল সে।

–এখানে কী হচ্ছে ভাই?

মেজাজ খারাপ হলো ছেলেটির। একটু ধমকের সুরেই জবাব দিলো :

–ব্যাটা অন্ধ নাকি? দেখতে পাচ্ছো না, কাগজে লেখা রয়েছে। একটু কষ্ট করে পড়ে দেখো।

–কী করে পড়বো। আমি তো পড়তে জানি না।

–হাতে বই দেখতে পাচ্ছি, আবার বলছো পড়তে পারো না। মানুষকে দেখানোর জন্য বই হাতে নিয়ে এসেছো। ভণ্ড কোথাকার।

–সত্যি ভাই, আমি পড়তে পারি না।

–তাহলে তো দেখছি তুমি একটা আস্ত গর্দভ। আচ্ছা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ওখানে লেখা আছে 'পুতুল নাচ'।

–কখোন শুরু হয়েছে?

–শুরু হয়নি এখনো। তবে খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

–আমি ভিতরে যেতে পারবো?

–তা তো পারবেই। তবে টাকা লাগবে।

–কতো টাকা?

–দশ টাকা।

পিনোকিও-র খুব ইচ্ছে হলো ভিতরে গিয়ে দেখে পুতুল কিভাবে খেলা করে। কিন্তু টাকা নেই। টাকা ছাড়া তো তাকে ঢুকতে দেবে না। একটু সাহস করে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে বললো :

–আমাকে দশটা টাকা ধার দেবে? আমি কালই ফেরত দেবো।

–দুঃখিত।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না সে। আবার বললো :

–মাত্র দশটা টাকা।

–কেনো আমি তোমাকে টাকা ধার দেবো? আমি কি তোমাকে চিনি? অচেনা কাউকে আমি টাকা ধার দিই না।

–তবে আমার এই জামাকাপড় বিক্রি করে দেবো।

–তোমার ঐ কাগজের পোশাক দিয়ে আমি কি করবো। তুমি আমাকে বলদ ভেবেছো নাকি?

একে একে জুতা টুপি সবকিছুই সে বিক্রি করতে চাইলো। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটি রাজি হলো না। অবশেষে হাতের বইটা দেখিয়ে বললো :

–তাহলে আমার এই বইটা নিয়ে আমাকে দশটা টাকা দাও।

ছেলেটার মনটা একটু নরম হলো। একটু দরদ-মাখা সুরেই বললো :

–দেখো, আমিও তো তোমার মতোই ছেলে মানুষ। আমার কাছে কি আর টাকা আছে? তাছাড়া আমার ঐ বইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা আমি অনেক আগেই পড়ে ফেলেছি। তুমি বরং পাশের দোকানে গিয়ে বিক্রির চেষ্টা করো। বলেই আঙুল দিয়ে একটা দোকান দেখিয়ে দিলো। দোকানদারের একটা ছোট্ট ছেলে ছিলো। কয়েকদিন ধরে বর্ণমালা কেনার কথা ভাবছিলো সে। কিন্তু সময় পাচ্ছিলো না। বইটা হাতে পেয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে পছন্দ হলো। বিশেষ করে ছড়ায় ছড়ায় বর্ণমালা শেখার কৌশলটাও খুব *ভালো লাগলো তার–*

*অ দেখে পালাচ্ছে অজগর*
*আ বলে আমি খাবো আঙ্গুর।*
*ই নিয়ে ইঁদুরের ভয় নেই*
*উ বলে উট চলে বালুতেই।*

পিনোকিও-র বইটা নিয়ে সে তাকে দশটা টাকা দিলো। মনের আনন্দে সে পুতুল নাচ দেখার জন্য সেই নাচঘরে চলে গেল।

ছোট্ট বন্ধুরা, দেখলে তো কাঠের পুতুলের কাণ্ড? বেচারা বোতল মিয়ার কথা একবারও ভাবলো না সে। বাবার গায়ের একমাত্র ছেঁড়া কোট বিক্রি করা টাকায় কেনা বর্ণমালা কতো সহজে দোকানীকে দিয়ে পুতুল নাচ দেখতে চলে গেল।

## দশ

*পুতুল নাচের পুতুলরা সব বলে ওঠে, 'পিনোকিও*
*অনেক দিনের বন্ধু তুমি প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও'।*
*পিনোকিও খুশি হয়ে তাদের সাথে মিলতে যায়*
*মাস্টার মুটো রাতে তাকে আগুনে ফেলতে চায়।*

পিনোকিও মনের আনন্দে নাচতে নাচতে ঢুকে গেল পুতুলের নাচঘরে। ঘরে ঢুকেই সে দেখলো, দুটো পুতুল ঝগড়াঝাটি মারামারি করছে।

বন্ধুরা, ঝগড়ারত পুতুল দু'টির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মঞ্চের ওপরে ছিলো 'ন্যাড়া' আর 'ট্যারা'। এরা হাত পা নেড়ে মহা গ্যাঞ্জাম শুরু করে দিয়েছে। কিল ঘুশি লাথি যে যেমন পারছে চালিয়ে যাচ্ছে।

পুতুলের এই কাণ্ড দেখে সবাই হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। কেবল ঝগড়াই নয় খুব বাজে আর অশ্লীল গালাগালি চলছিলো তখন। পিনোকিও ঘরে ঢুকেই হাতে তালি দিতে দিতে বললো :

*চলুক তবে ঝগড়াঝাটি মারামারি*
*খুশি হয়ে সবাই খাবে গড়াগড়ি।*

এই ছড়া শুনে, নাকি পিনোকিও-কে দেখে ঠিক বলতে পারবো না, হঠাৎ ন্যাড়া ও ট্যারার ঝগড়া-মারামারি-গালাগালি থেমে গেল। দর্শকের ভেতরে

পিনোকিও-কে দেখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে চেঁচাতে শুরু করলো। পিনোকিও তো অবাক! আবার কি ঝামেলা শুরু হলো? ট্যারা দুহাত তুলে তাকে ডাকতে শুরু করলো :

–পিনোকিও, বন্ধু আমার। কতো দিন পরে দেখা। এতোদিন কোথায় ছিলে?

ন্যাড়া তো আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললো। যেন তার সবচেয়ে কাছের মানুষকে সে খুঁজে পেয়েছে। মঞ্চের ওপর নাচতে নাচতে বললো :

–এসো ভাই, আমার বুকে এসো। তুমি আমার কাঠের বন্ধু। তোমাকে আলিঙ্গন করে জীবন ধন্য করি।

পিনোকিও তার বন্ধুদের এই উষ্ণ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলো না। এক লাফে একেবারে মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর তিনজনে মিলে কি যে জড়াজড়ি-গড়াগড়ি-ঢলাঢলি, তা তোমাদের বলে বুঝাতে পারবো না।

ততোক্ষণে উপস্থিত দর্শকের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। কারণ তারা টাকা দিয়ে পুতুলের নাচ-গান-খেলা দেখতে এসেছে। নতুন এই পুতুলের আগমনে পুতুল নাচ বন্ধ হওয়ায় তারা বিরক্ত। সবাই মিলে এমন চিৎকার শুরু করে দিলো যে মনে হলো আকাশ ভেঙে পড়বে। তারা 'পুতুল নাচ' 'পুতুল নাচ' বলে চেঁচাতে লাগলো। ফলে ন্যাড়া, ট্যারা ও পিনোকিও-র মধ্যে কি কথাবার্তা হলো কিছুই শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল পিনোকিও ন্যাড়া ও ট্যারার ঘাড়ে দুই পা দিয়ে দর্শকের দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে :

–প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা চুপ করুন।

কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।

অবশেষে মঞ্চে এলেন পুতুল মাস্টার। তাকে দেখেই সবার মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। পেটকে পেট না বলে ড্রাম বলাই ভালো। তিনি হাঁটতে হাঁটতে এলেন না গড়াতে গড়াতে এলেন ঠিক বলা মুশকিল। মঞ্চে ওঠার সময় দাড়ির সঙ্গে খুঁটির প্যাচ লেগে আছাড় খেয়ে পড়লেন দু'তিনবার। এতো বড়ো দাড়ি দেখে সবাই অবাক।

রাগে তার শরীর কাঁপছিলো। আর ঘনঘন নিঃশ্বাস নেওয়ায় পেটটা যখন ওঠা নামা করছিলো তখন সত্যিই একটা দেখবার মতো দৃশ্য হলো। তিনি মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ হয়ে গেল। আর পুতুলগুলো যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেল। বাঘ দেখেও তো মানুষ এতো ভয় পায় না। সত্যি কথা বলতে কি,

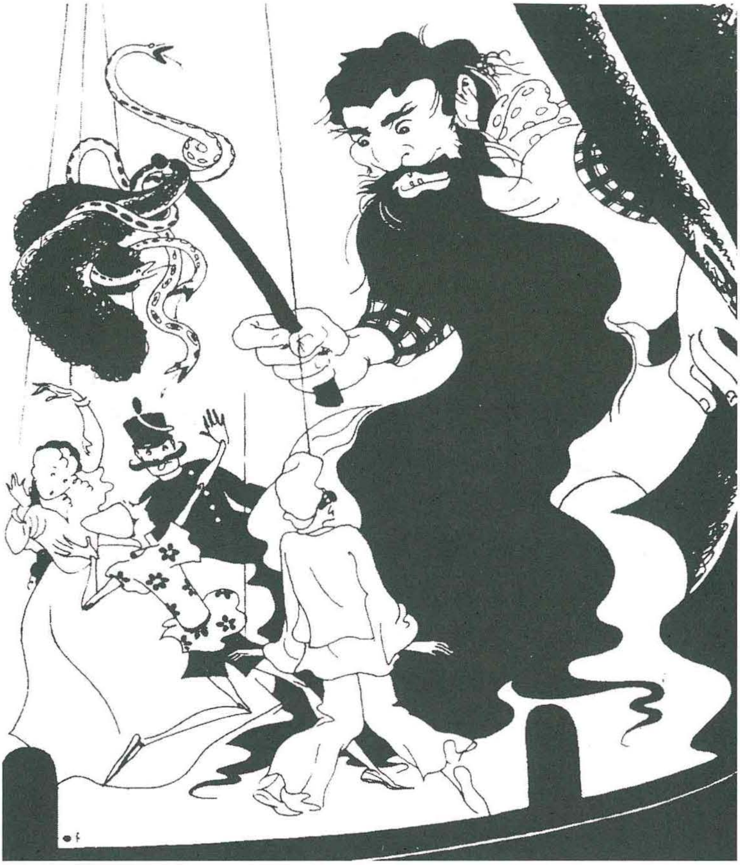

পুতুলরা সবাই তাদের মাস্টারকে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পেতো।

পিনোকিও-র দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন :

–বলো বেয়াদব, মঞ্চের খেলা পণ্ড করলে কেনো?

–আমার কোনো দোষ নেই, ওরাই আমাকে...

কথা শেষ করতে পারলো না পিনোকিও। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে।

পুতুল মাস্টার মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশাল পেটটি দর্শকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো :

–দর্শকবৃন্দ আজকের মতো পুতুলের খেলা-পালা-নাচ-গান বন্ধ।

পুতুল নাচের সমাপ্তি ঘোষণা করে মাস্টার পিনোকিও-র ঘাড় ধরে সাজঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললো:

—তুমি আমার খেলা পণ্ড করেছো। আজ রাতেই তোমার বিচার হবে।

পিনোকিও-র কোনো কথাই তিনি শুনলেন না। ভয়ে বেচারা কাঁদতেও ভুলে গেল। কে জানে আজ কপালে কী আছে। তাকে ভেতরে নিয়ে একটি পেরেক দিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

পুতুল মাস্টার সোজা চলে গেলেন বাবুর্চিখানায়। সেখানে তিনটে ছাগল জবাই করে রাখা হয়েছে। মাস্টার একবার তিনটে ছাগলের মাংস সাবাড় করতে পারেন। যেমন পেট তেমন তার আহারের ব্যবস্থা। রান্না করতে গিয়ে জ্বালানি সংকট দেখা দিলো। এদিকে খিদেয় তো মাস্টারের পেটে আগুন জ্বলছে। তাই চুলোর আগুন কিছুতেই নিভতে দেওয়া যাবে না। কোনো উপায় না দেখে ন্যাড়া ও ট্যারাকে হুকুম দিলেন :

—পেরেকে ঝুলানো পুতুলটা নিয়ে এসো। শুকনো কাঠ। জ্বালানি হিসেবে মন্দ হবে না।

বেচারা ন্যাড়া ও ট্যারার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। কিন্তু মালিকের হুকুম পালন না করে উপায় নেই। পিনোকিও-কে নিয়ে আসা হলো।

পিনোকিও 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে লাগলো।

## এগার

*মাস্টার মুটোর দয়ায় এবার পিনোকিও মুক্ত*
*তাই বলে কি খাসির মাংস থাকবে কাঁচা শক্ত?*
*আগুন তো জ্বালাতে হবে জ্বালানি চাই আরো*
*মুটো হুকুম দিলেন, 'ট্যারাকে আজ মারো' ।*
*পিনোকিও-র কান্নাকাটি বুক হলো খান খান*
*অবশেষে মুটোর দয়ায় ট্যারার বাঁচে প্রাণ ।*

বিশাল দেহী সেই পেট মোটা মাস্টারের নাম ছিলো মুটো । সবাই ভালোবেসে তাকে মাস্টার মুটো বলেই ডাকতো । তার লম্বা দাড়ির কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে । সেই দাড়িতে তার পা দুটোও ঢেকে থাকতো । পিনোকিও তো মাস্টারের পা জড়িয়ে কাঁদতে গিয়ে প্রথমে তার পা-ই খুঁজে পাচ্ছিলো না ।

কালো ও পেট মোটা মাস্টার কিন্তু খুব খারাপ মানুষ নয় । তার ফুটবলের মতো মাথা আর ড্রামের মতো পেটে কেবল রাগই ছিলো না, দয়ামায়াও ছিলো । পিনোকিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য যখন মাস্টার মুটোর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে গান গাইছিলো :

*মেরো না গো মাস্টার মশাই ধরি আপনার পায়*
*আমাকে না পেয়ে বাবার প্রাণ করে হায় হায়।*
*দয়া করে দেন গো ছেড়ে ফিরে যাবো ঘরে*
*আমার জন্য বুড়ো বাবা ছটফটাইয়া মরে।*

পিনোকিও-র কান্না শুনে নাচের পুতুলগুলো চোখের জল রাখতে পারলো না। সবাই আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। মাস্টার মুটোরও মনটা কেমন যেন করে উঠলো। বিশেষ করে বুড়ো বাবার কথা শুনে তার খুব কষ্ট হলো। বেচারা বুড়ো তার ছেলেকে হারিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকবে! মুটো তখন আকাশের দিকে চোখ তুলে ক্রমাগত গোঁফে তা দিতে লাগলো। ন্যাড়া ট্যারাসহ সকল পুতুলেরই তখন আনন্দে মন ভরে গেল। তারা সবাই জানে যে মাস্টার মুটোর মনটা যখন নরম হয় তখন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিতে থাকেন। ন্যাড়া কানে কানে পিনোকিও-কে বললো:

–তুমি বেঁচে গেছো ভাই। মাস্টারের দয়া হয়েছে। দেখছো কেমন হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিতে শুরু করেছে।

মাস্টার মুটো তখন পিনোকিও-র মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো: –কেঁদো না বাবা। তোমার কান্নায় যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন।

তখন পিনোকিও-র কি যে আনন্দ তা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। খুশিতে সে হাসির পরিবর্তে কাঁদতে শুরু করলো। তোমরা তো জানো, মানুষ খুব বেশি খুশি হলে মনের আনন্দে কখনো কখনো কেঁদে ফেলে। তখন মাস্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পিনোকিও বললো :

–আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনার পুতুল নাচের ব্যবসায় উন্নতি হোক। আপনার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

–তোমার জন্যও আমার শুভ কামনা রইলো।

তারপর মুটো একে একে পুতুলের বাবা-মায়ের খোঁজ নিলো। মা নেই শুনে আবার তাকে সান্ত্বনা দিলো। বুড়ো বাবার কথা ভেবে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বোতল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পিনোকিও-র বুক ভরে গেল। এমন ভালো মানুষও আছে পৃথিবীতে!

সমস্যা কিন্তু রয়েই গেল। ছাগলের মাংস সিদ্ধ না হলে তো মাস্টার মুটোর পেটের আগুন নিভবে না। যেমন করেই হোক জ্বালানির ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। মায়ায় পড়ে পিনোকিও-কে মুক্ত করে দিয়ে মহা মুশকিলে পড়ে গেল সে। এখন কী করা যায়? হঠাৎ মনে পড়লো ট্যারার কথা। ট্যারা-চোখা এই পুতুলটার প্রতি তার খুব রাগ ছিলো। নাচতে জানে ভালোই। কিন্তু সে তাকায় একদিকে আর চোখ থাকে অন্যদিকে। আবার মাঝে মাঝে মাস্টারের অবাধ্যও সে হয়। তাই সিদ্ধান্ত নিলো : জ্বালানি হিসেবে এবার ট্যারাকেই চুলোয় ঢুকিয়ে দেবে। আগে তো জান বাঁচাতে হবে। তারপর ব্যবসার কথা। হুকুম দিলো : ট্যারাকে বেঁধে আগুনে ফেলে দাও। ছাগলের মাংস ভালো করে সিদ্ধ করে আমার সামনে হাজির করো।

এই ঘোষণায় ট্যারার অবস্থা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। মাস্টার মুটোর পা জড়িয়ে ট্যারার সে কি কান্না। মাস্টারের মন কিছুতেই নরম হয় না। পেটের আগুনে যেন তার মনটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে পিনোকিও-র মনে হলো, এবার তার কিছু একটা করা দরকার। এই ট্যারাই তো বলতে গেলে তার জীবন বাঁচাতে সবার আগে এগিয়ে এসেছে। একে এভাবে মরতে দেয়া যায় না। সে বলতে শুরু করলো :

–আমার একটি আর্জি আছে জনাব। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার বন্ধুর প্রাণের বিনিময়ে আমি বাঁচতে চাই না।

–কি বলতে চাও তুমি? তুমি কি চাও তোমাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে আমি না খেয়ে মারা যাই?

–আমার দাবি একটাই। আপনি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে সেই ভালোবাসার দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আমার বন্ধু ট্যারার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।

–সেটা হয় না পিনোকিও। আমার এখন সিদ্ধ খাসির মাংস চাই।

–আমার অনুরোধে আপনার যদি দয়া না হয় তাহলে আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। প্রিয় পুতুল বন্ধুরা। তোমরা আমাকে বিদায় দাও। আমি এখনই ঐ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার প্রাণ দানকারি বন্ধু ট্যারার জীবন বাঁচাবো। আমার প্রতি তোমরা যে চমৎকার আচরণ করেছো, তাতে গর্বে আমার বুক ভরে

গেছে। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমার জীবনের বিনিময়ে যদি বন্ধু ট্যারার জীবন বাঁচে তাহলে আমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না। কখনো যদি আমার বাবা বোতল মিয়ার সঙ্গে তোমাদের দেখা হয় তবে তাকে বলো : পিনোকিও তার বন্ধুর জীবন বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

নাচঘরের সমস্ত পুতুল কাঁদতে লাগলো। ঠিক তখনই মাস্টার মুটো আকাশের দিকে হা করে গোঁফে হাত বুলিয়ে তা দিতে শুরু করলো। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মাস্টার মুটোর দয়া হয়েছে। ট্যারার জীবন এখন শঙ্কামুক্ত।

মাস্টার মুটো ট্যারাকে নয়, পিনোকিও-কেই বুকে জড়িয়ে ধরলো। আবেগে তার কপালে চুমু খেতে খেতে বললো :

–তুমি সত্যিই খুব ভালো পিনোকিও। তোমার ব্যবহারে আমি সত্যিই মুগ্ধ। বন্ধুর জীবন বাঁচাতে যে তার নিজের জীবন দিতে পারে সেই তো প্রকৃত বন্ধু। কথায় বলে : বিপদেই বন্ধুর পরিচয়। তুমি আজ আমার মুখ উজ্জ্বল করেছো। আজ আমি তোমার বাবাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। তোমার মতো এমন সুন্দর লক্ষ্মী ছেলে যার আছে সে সত্যিই ভাগ্যবান। আমার বুকে এসো।

তোমাকে চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দেই।

পিনোকিও নিজেও মাস্টার মুটোর কপালে, হাতে ও ভুঁড়িতে চুমু খেলো। মাস্টার মুটো তার দাড়ি দিয়ে পিনোকিও ও ট্যারার চোখের জল মুছে দিলো। সগর্বে ঘোষণা দিলো :

–পিনোকিও-র সম্মানে আজ রাতে আমি আধাসিদ্ধ ছাগলের মাংসই খাবো। তোমরা সবাই যে যার মতো ঘুমোতে যাও। আগামীকাল আবার দেখা হবে। শুভ রাত্রি।

কিন্তু কোনো পুতুলের চোখেই ঘুম নেই। তারা সবাই মিলে পিনোকিও-র সম্মানে এক নাচসভার আয়োজন করলো।

ন্যাড়া ট্যারাসহ সকল পুতুল নেচে গেয়ে পিনোকিও-কে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানালো। অবশেষে পিনোকিও-র প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলো সবাই। পিনোকিও মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুরে সুরে গেয়ে উঠলো :

*বুকে এসো বন্ধু আমার*
*আমরা সবাই ভাই ভাই।*
*বেঁচে আছি ভালো আছি*
*আর কোনো দুঃখ নাই।*

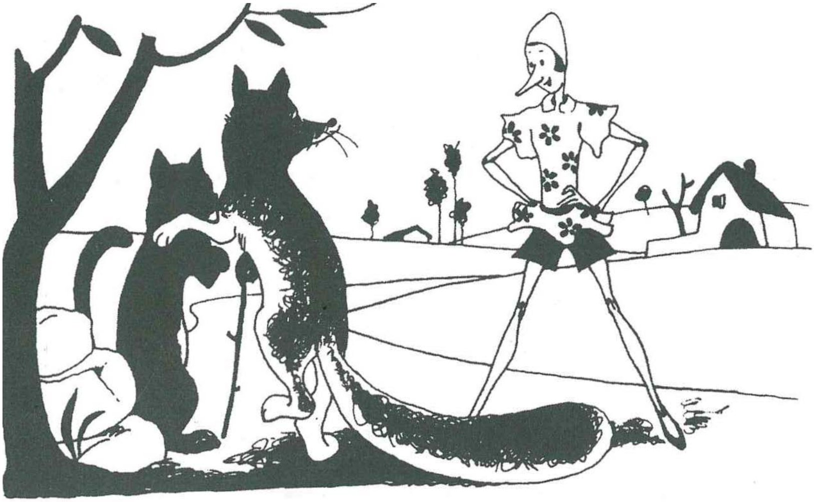

## বারো

*বিদায় বেলা পাঁচটি সোনার মোহর পেলো পিনোকিও*
*মাস্টার মুটো বললো, বাড়ি গিয়ে তোমার বাপকে দিও।*
*পথে গিয়ে ধরা খেলো নেকড়ে বাঘ, বিড়ালের ফাঁদে*
*তোতা পাখির দেশে গিয়ে কাঠের পুতুল একলা কাঁদে।*

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো। যাবার সময় মাস্টার মুটো পিনোকিও-র কাছে তার বাবা সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলো। পিনোকিও সব কথা খুলে বললো। নিজের একমাত্র কোট বিক্রি করে বর্ণমালা কিনে দেয়ার কথাও বললো। খুব মায়া হলো মাস্টার মুটোর। পিনোকিও-র ব্যবহারে খুশি হয়ে পাঁচটি সোনার মোহর দিয়ে বললো :

–এই মোহরগুলো তোমার বাবার হাতে দিয়ে বলো, মাস্টার মুটো তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

কৃতজ্ঞতায় পিনোকিও-র চোখে জল এলো। বিদায় বেলা মাস্টার মুটোর কপালে ও ভুঁড়িতে চুমু খেলো। মাস্টার তার দাড়ি দিয়ে পিনোকিও-র চোখ মুখ মুছে দিয়ে প্রাণ ভরে আশির্বাদ করলেন। সব নাচুনে পুতুলেরা একে একে

পিনোকিও-র সাথে কোলাকুলি করলো ও চুমু খেলো। সবার চোখেই জল। সবচেয়ে বেশি কাঁদলো ট্যারা। সবাইকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো।

পিনোকিও বাড়ির দিকে হাঁটছে আর সোনার মোহর দিয়ে কি কি করবে তার হিসেব করছে। মাইলখানেক যেতেই একটা খোঁড়া নেকড়ে বাঘ ও একটা অন্ধ বিড়ালের সঙ্গে দেখা হলো। অন্ধ বিড়ালের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়া বাঘটা হাঁটছে আর গল্প করছে। পিনোকিও-কে দেখে তারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সম্ভাষণ করে সামনে এগিয়ে এলো।

–আপনার মঙ্গল হোক পিনোকিও।

–আপনাদেরও।

–গতকাল আপনার বাবাকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই শীতের মধ্যে খালি গায়ে দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

–বাবাকে আর শীতে কষ্ট করতে হবে না।

–কেন?

–আমাদের আর কোনো অভাব থাকবে না। আমি তো এখন অনেক টাকার মালিক। বাবার জন্য বাজারের সবচেয়ে দামি ও সুন্দর কোট কিনে দেবো আমি।

–আমাদের সঙ্গে আপনার ঠাট্টা করা উচিত নয় পিনোকিও। আপনাকে আমরা সম্মান করলেও বয়সে আমরা আপনার বড়োই হবো। বড়োলোক হওয়া অতো সহজ নয়।

–আপনাদের বিশ্বাস না হলে আমার ক্ষতি নেই। এই দেখুন, আমার হাতে এগুলো সোনার মোহর।

বলেই মোহরগুলো নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালের সামনে মেলে ধরলো। বাঘ ও বিড়ালের মধ্যে এরই ফাঁকে চোখাচোখি এবং চোখ টিপে হাসাহাসি হয়ে গেল। ব্যাপারটা পিনোকিও-র চোখেই পড়লো না। পিনোকিও আবার বলতে শুরু করলো :

–বাবার জন্য তো অনেক কিছুই কিনতে হবে। তবে সবার আগে চাই আমার বর্ণমালা। আবার স্কুলে যাবো। মন দিয়ে লেখাপড়া করবো।

নেকড়ে বাঘের চোখটা চকচক করে উঠলো। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পিনোকিও-কে বললো :

–পড়াশোনার চিন্তা মাথায়ও আনবেন না শ্রদ্ধেয় পিনোকিও। আপনাকে আমরা অত্যন্ত পছন্দ করি বলেই সাবধান করে দিচ্ছি। লেখাপড়া করতে গিয়েই তো আমি আজ খোঁড়া আর আমার বন্ধু বিড়াল আজ অন্ধ।

এমন সময় একটি তোতা পাখি রাস্তার পাশের একটা বকুল গাছ থেকে কথা বলে উঠলো :

–পিনোকিও, ওদের কথা শুনো না। তোমার বিপদ হবে।

এই কথা শোনামাত্র বিড়ালটা এক লাফে বকুল গাছে ওঠে তোতা পাখিটাকে ধরে মচমচ করে খেয়ে ফেললো।

খেয়ে দেয়ে সামনের দুই পা দিয়ে মুখ মুছে আগের জায়গায় চলে এলো। পিনোকিও-র মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ওকেই তো কি যেন বলতে চেয়েছিলো পাখিটা। আহা বেচারা তোতা!

–এটা খুবই অন্যায় হলো অন্ধ বিড়াল। তোতা পাখিটাকে এভাবে খতম করা তোমার উচিত হয় নি।

–এসব আপনি বুঝবেন না পিনোকিও। ও আমাদের কথার মাঝখানে কথা বলে বেয়াদবি করেছে। বেয়াদবদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

কথা বলতে বলতে তিনজন পাশাপাশি হাঁটছিলো। এমন সময় পিনোকিও-কে একটি প্রস্তাব দিলো খোঁড়া নেকড়ে বাঘ :

–আপনি চাইলেই আপনার এই টাকা দ্বিগুন তিনগুন এমন কি চারগুন পর্যন্ত করতে পারেন।

–কীভাবে?

–যদি চান তো বলুন। আমরা ব্যবস্থা করবো।

–কী করতে হবে বলুন, আমি ভেবে দেখি।

–ভেবে সময় নষ্ট করা যাবে না। যদি টাকা বাড়াতে চান তো আমাদের সঙ্গে চলুন।

–আমাকে কোথায় যেতে হবে?

–ধনকুবেরের দেশে।

কিছুক্ষণ ভাবলো পিনোকিও। তারপর বললো :

–ধনের দেশে আমি যেতে চাই না। আমি আর বাবার অবাধ্য হতে চাই না। অবাধ্য, অশান্ত ও দুষ্টু ছেলেদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমি অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ থেকে বেঁচে এসেছি। আমি আর কোথাও যাবো না। সোজা বাবার কাছে যাবো।

নেকড়ে বাঘ বেশ বিজ্ঞের মতো বললো :

–আমরা তো আপনাকে জোর করে নিতে চাই না। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। আপনি যদি বুঝতে না চান তো সে ক্ষতি আপনারই।

অন্ধ বিড়ালও নেকড়ের কথায় সায় দিলো। দোটানায় পড়ে গেল পিনোকিও। টাকা বাড়ানোর এই সুযোগ হাতছাড়া করতেও ইচ্ছে করছিলো না। আবার বাবার কাছে ফিরে যাওয়ারও ইচ্ছে হচ্ছিলো।

–আপনি আরো একটু ভাবুন পিনোকিও। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে নিজেরই ক্ষতি।

–নেকড়ের বক্তব্যে অন্ধ বিড়াল লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে সম্মতি জানালো।

–কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

নেকড়ে তখন ধনকুবেরের দেশে একটি রত্ন ক্ষেতের বর্ণনা দিলো যেখানে গাছের চারার মতো মোহর রোপণ করে কয়েক বালতি পানি ঢালতে হবে। সকালে দেখা যাবে সেখানে একটি মোহর গাছ গজাবে। সেই গাছেই পাওয়া যাবে সোনার মোহর। যে রকম আম গাছে আম ধরে, তাল গাছ তাল, সেভাবেই মোহর গাছে মোহর ঝুলে থাকবে।

পিনোকিও-র মন গলে একেবারে নরম মাটি হয়ে গেছে। বাবার কথা ভুলে সে টাকা বাড়ানোর ধান্ধা করতে লাগলো। কিন্তু নিজের বাড়ানো সোনার মোহর খোঁড়া বাঘ বা অন্ধ বিড়ালের হাতে দেয়ার মতো বোকা সে নয়। তাই সে আগেই বলে নিলো :

–আপনারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাকে ফি দিতে রাজি আছি। কিন্তু তা হবে প্রতি একশ' সোনার মোহরের জন্য একটি মোহর। এবার ভেবে দেখুন আপনাদের পোষাবে কি-না।

বাঘ ও বিড়াল চোখে চোখে তাদের কথাবার্তা সেরে ফেললো। একটা চমৎকার মওকা মিলেছে। এটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। খোঁড়া বাঘ বিজ্ঞের মতো বললো :

–দেখুন পিনোকিও, আমরা টাকার লোভে মানুষের উপকার করি না। আমাদের কোনো সম্মানী বা উপহার আপনাকে দিতে হবে না। আমরা নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্য কাজ করি। আমাদের এখন বয়স হয়েছে। এখন আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। আপনার জন্য কিছু করতে পারলেই আমরা খুশি।

অন্ধ বিড়ালও বাঘের সঙ্গে যোগ করলো :

–পরকে ধনী করতে পারলেই আমরা আনন্দিত। আমাদের কথা আমরা ভাবি না। যে কদিন বাঁচবো নিজের চেষ্টাতেই বাঁচতে চাই।

পিনোকিও-র মনের নরম মাটি এবার কাদায় পরিণত হলো। এতো চমৎকার কথা! আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। টাকার লোভে সে বিড়ালের চেয়েও বড়ো অন্ধ হয়ে বললো :

–তাহলে আর দেরি কেনো? চলুন। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাবো।

ভেবে দেখো বন্ধুরা। এক মুহূর্তে সে বাবার কথা, তার কোটের কথা, বর্ণমালার কথা ভুলে গেল। প্রতারক নেকড়ে বাঘ আর ভণ্ড বিড়ালের সঙ্গেই সে ধনকুবেরের দেশে যাত্রা করলো।

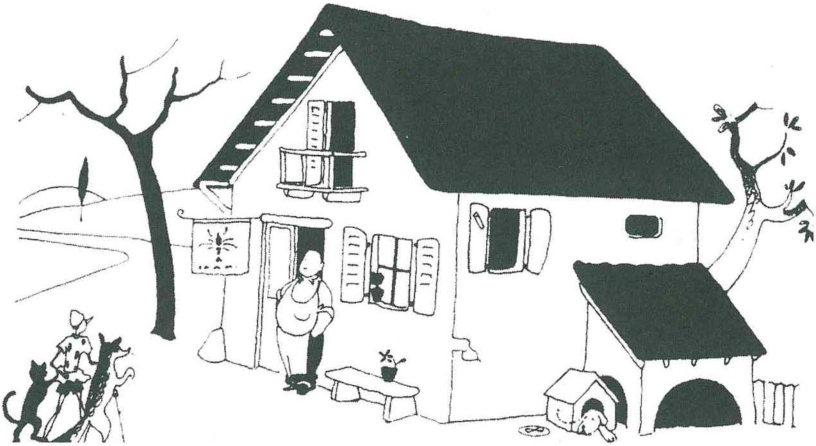

## তেরো

*পিনোকিও যাচ্ছে এখন ধনের দেশে*
*সঙ্গে আছে বাঘ ও বিড়াল বন্ধু বেশে ।*
*ক্লান্ত হয়ে বসলো গিয়ে খাবার ঘরে*
*সব কিছু বাঘ বিড়ালেই সাবাড় করে!*
*খাবার খেয়ে ধূর্ত দুটি বিদায় নিলো*
*পিনোকিও দোকানদারকে মোহর দিলো ।*

পিনোকিও, খোঁড়া নেকড়ে বাঘ আর অন্ধ বিড়াল চলছে তো চলছেই । কতো আর এভাবে হাঁটা যায়, বলো? এদিকে আবার সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো । শরীরে আর এক বিন্দু বল নেই । অবশেষে তারা একটি খাবার হোটেলে প্রবেশ করলো । হোটেলে হরেক রকমের খাবার । রকমারি মাছ, মাংস, আর সবজির সমাহার । লাল রঙের চিংড়ি মাছগুলো যেন চোখ বড়ো বড়ো করে পিনোকিও-র দিকে তাকিয়ে আছে ।

বাঘই এবার প্রস্তাব করলো :

—এখানেই খেয়ে দেয়ে আজ রাতটা বিশ্রাম নিই । আগামীকাল ভোরে আবার রওয়ানা দেবো । ধনকুবেরের দেশে পৌঁছাতে হয়তো বিকেল হবে । তাতে কি? আমরা তো রাতের বেলাতেই মোহর রোপণ করবো ।

নেকড়ে বাঘের খাওয়া দেখে তো পিনোকিও-র চক্ষু চড়ক গাছ। দোকানে গরু-খরগোশ-হাঁস-মুরগি-ইঁদুর-টিকটিকি-গুইসাপ যা কিছু ছিলো প্রায় সবই সাবাড় করে দিলো সে। সব শেষ করে শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বললো :

–দেহটা ভালো নেই পিনোকিও সাহেব। তাই আর খেতে ইচ্ছে করছে না। এছাড়া আমার ডাক্তারও বেশি খেতে নিষেধ করেছেন। বুঝেনই তো। এখন বয়স হয়েছে। আগের মতো আর পারি না। একটা সময় ছিলো...

কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। একটা ঢেকুর তুলেই সব ভুলে গেল। শরীরটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো :

–হ্যা কি যেন বলছিলাম...।

বিড়ালের অবশ্য মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি প্রিয়। তাই সে মাংস থেকে হাড়গুলো বের করে করে খাচ্ছিলো। বাঘের ফেলে দেয়া কিছু হাড়ও সে মাথা ও ঘাড় কাত করে ভাঙার চেষ্টা করলো। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে বললো :

–মুখে আর রুচি নেই পিনোকিও সাহেব। কিছুদিন যাবৎ আবার ডায়েট কন্ট্রোল, মানে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করছি। প্রতিদিন বিশটা ইঁদুরের স্যুপ, চারটা মুরগীর বাচ্চা ফ্রাই, দেড় কেজি দুধ– এর বেশি খাই না। বুঝেন তো, শরীরটা ঠিক রাখা চাই। দেহ ভালো তো সব ভালো।

এই দুই রাক্ষুসের খাওয়া দেখে পিনোকিও তার খাবার কথা ভুলেই যাচ্ছিলো। তবু পেটে খিদে ছিলো খুব। খাসির রেজালার সঙ্গে কয়েকটা রুটি খেয়ে মিষ্টি জর্দা দিয়ে একটা পান খেলো সে। তার মনের ভেতর অস্থিরতা। ধনের দেশে কখন যাবে, আর কখন তার মোহরগুলো রোপণ করে হাজার গুন বাড়িয়ে নেবে এই চিন্তায় তার খাওয়া ঘুম সব হারাম হয়ে গেছে।

খেয়ে দেয়ে হোটেলের মালিককে নেকড়ে বাঘ বললো :

–আমাদের জন্য দুটো ঘর দেখিয়ে দিন। পিনোকিও সাহেব সম্মানিত মানুষ। তার জন্য সবচেয়ে ভালো ঘরটা দিবেন। আর আমাদের দুজনের জন্য একটা ঘর। আর ভোর বেলা আমাদেরকে জাগিয়ে দিবেন। দূরের রাস্তা। একটু আগে-ভাগেই রওয়ানা দিতে চাই।

হোটেল মালিক নেকড়ে বাঘের চোখে চোখ রেখে কেমন যেন পিট পিট করে হাসলো। তারপর বললো :

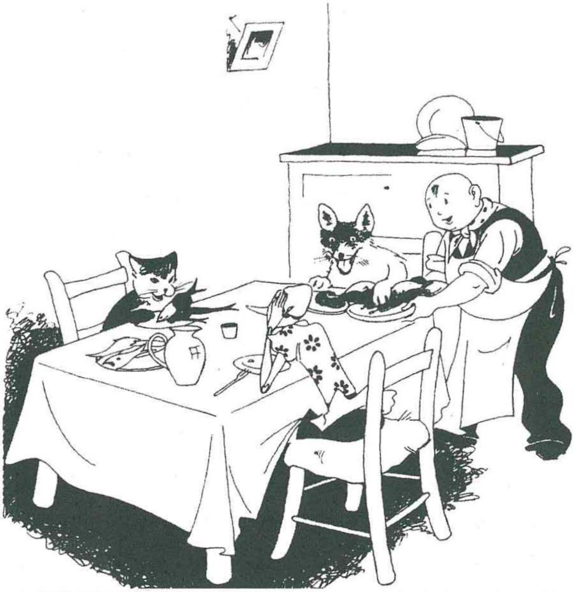

–কোনো চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হবে। আপনারা দয়া করে এই গরিবের হোটেলে এসেছেন। আপনাদের অমর্যাদা হবে না।

তারপর 'শুভ রাত্রি' বলে পিনোকিও-কে বিদায় দিয়ে নেকড়ে ও বিড়াল নিজেদের ঘরে চলে গেল।

হোটেলের যে ঘরটিকে পিনোকিও শুয়ে আছে তা বেশ ভালোই বলতে হবে। বেশ আরামদায়ক বিছানা। কিন্তু পিনোকিও কিছুতেই ঘুমাতে পারলো না। কেবলি মোহরের স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে। যে দিকে তাকায় কেবল মোহর আর মোহর। সে স্বপ্নের ঘোরে মোহরগুলো একটা বস্তায় ভরতে লাগলো। বস্তার মুখ বন্ধ করতে যাবে এমন সময় দরোজায় হোটেল মালিকের করাঘাত শুনে পিনোকিও-র ঘুম ভেঙে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরের দরোজা খুলে বললো :

–ভোর হয়ে গেছে দেখছি। বিজ্ঞ নেকড়ে বাঘ ও পণ্ডিত বিড়ালের কি ঘুম ভেঙেছে? তারা কি প্রস্তুত?

হোটেল মালিক মুচকি হেসে বললো :

–এ আপনি কি বলছেন শ্রদ্ধেয় পিনোকিও! তারা তো অনেক আগেই বিদেয় হয়েছেন।

–খাবারের বিল দিয়েছে তো?

–সে কি হয় জনাব? আপনি সম্মানিত লোক। বিল দিয়ে ওরা কি আপনাকে অপমান করতে পারে?

পিনোকিও কতোক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো। উপায়ান্তর না দেখে দোকান মালিকের হাতে একটা সোনার মোহর তুলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে।

বাইরে এসে পিনোকিও-র গা ছমছম করতে লাগলো। রাগে দুঃখে নিজেই নিজের কপালে কয়েকবার আঘাত করলো। কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারছিলো না সে। রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের ওপর বসে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলো। এমন সময় একটা পাখি পিনোকিও-কে ঘিরে ওড়াওড়ি করতে লাগলো। উড়তে উড়তে একবার পিনোকিও-র নাকের ডগা ছুঁয়ে গেল পাখিটি। ভয় আরো বেড়ে গেল। চিৎকার করে উঠলো সে :

–কে? কে এখানে?

–কোনো সাড়া শব্দ নেই। কেবল পিনোকিও-র কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল। অবশেষে পাখিটি পিনোকিও-র সামনের একটা কাঁঠাল গাছে এসে বসলো। বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রইলো পিনোকিও-র চোখের দিকে।

–একটু সাহস হলো পিনোকিও-র। মনে হলো পাখিটি তাকে কিছু বলতে চায়। সে জিজ্ঞেস করলো :

–কে তুমি? দয়া করে তোমার পরিচয় দাও।

–তোমার কি ঝিঁঝিঁ পোকার কথা মনে আছে?

–মনে নেই মানে! তার কথা না শুনেই তো আমার আজ এই দশা।

–আমি ঝিঁ-ঝিঁ পোকার প্রচ্ছায়া। অনেক কষ্টে যেন জবাব দিলো পাখিটি। ওর জন্য খুব মায়া হলো পিনোকিও-র। জানতে চাইলো :

–এখানে কেনো এসেছো তুমি?

–তোমার জন্যই তো আসতে হলো। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। এখানে আর এক মুহূর্ত দেরি করো না। যে চারটি সোনার মোহর আছে তা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যাও। বোতল মিয়া তোমাকে না দেখে পাগলের মতো হয়ে গেছে। এতো টাকার লোভ করো না। তোমার জানা উচিত : লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু।

–কিন্তু আমি তো ধনকুবেরের দেশের খুব কাছে এসে পড়েছি।

–এই পথে খুব বিপদ পিনোকিও।

–তবু আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে চাই।

–এখনো সময় আছে। লোভ ত্যাগ করে ঘরের দিকে যাও। নইলে আরো অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে।

–আমি এই পথের শেষ দেখতে চাই। তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

–খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

বলেই ঝিঁঝিঁ পোকার প্রচ্ছায়া উধাও হয়ে গেল। চারদিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে পিনোকিও।

একা।

## চৌদ্দ

*ঝিঁ-ঝিঁ পোকা বিদায় নিলো পিনোকিও একা*
*অন্ধকারে পথঘাটও যায় না তেমন দেখা।*
*গুণ্ডা এসে হাজির হলো সোনার মোহর নিতে*
*পিনোকিও ভাবলো : শেষে প্রাণ হবে কি দিতে?*

কোনো উপদেশই পিনোকিও সহ্য করতে পারে না। বড়োরা এবং বুড়োরা কেনো যে এতো উপদেশ দেয়! অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে এসব কথাই ভাবছিলো পিনোকিও :

–ছোটদের জীবনে অনেক কষ্ট। তারা নিজের ইচ্ছেমতো কিছুই করতে পারে না। এতো বাধা এতো নিষেধ। সুযোগ পেলেই কেবল জ্ঞানের কথা শোনাবে। এমন কি এই ঝিঁ-ঝিঁ পোকাটাও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়ে না। আমি কি এতোই বোকা যে সামান্য একটা পোকার কথায় সোনার মোহর লাভ করার সুযোগ হাতছাড়া করব? আমি ভাই বুড়োদের কথামতো চলতে পারব না। আমি যা খুশি তাই করবো, যখন যেখানে খুশি যাবো। কে আমাকে বাধা দেবে? কত রকম ভয় যে ওঁরা দেখায়। চোরের ভয়, ডাকাত-গুণ্ডার ভয়, ভূতের ভয়– আরো কতো কি। ডাকাত এলে কি আমার সাথে পারবে?

*ভূত এলেই দেবো গুতো*
*ঘাড় ভেঙে করবো খুঁতো।*
*ডাকাত এলে ভাঙবো দাঁত*
*আমার আছে কাঠের হাত।*
*বদমাশকে বলবো : দাঁড়া*
*শুইয়ে দেবো বালিশ ছাড়া।*
*কে লড়বে আমার সাথে?*
*ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো হাতে।*

আপন মনে ছড়া কাটতে কাটতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। এমন সময় কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলো সে। থমকে দাঁড়ালো। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা! আমি কিছুতেই ভয় পাবো না। মরে গেলেও না। এসব ভাবতে ভাবতেই ভূতের মতো দুটো মূর্তি পিনোকিও-র সামনে এসে দাঁড়ালো। গানের সুরে গুনগুন করে ভয় কাটানোর চেষ্টা করলো সে। মূর্তি দুটোর হাঁটার ভঙ্গি কি অদ্ভুত! এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে কেনো? ওরা কি পা চালাতে পারে না?

পিনোকিও তখন চারটি সোনার মোহর নিয়ে ভাবছিলো। যেভাবেই হোক এ চারটি মোহর তাকে রক্ষা করতেই হবে। বুদ্ধি করে মোহরগুলো মুখের ভেতর পুরে ফেললো। সেই ছায়ামূর্তি চিৎকার করে বলতে লাগলো :

–যদি বাঁচতে চাও তো টাকা পয়সা যা কিছু আছে আমার হাতে দিয়ে দাও।

পিনোকিও কোনো কথাই বললো না। কেমন করে বলবে? মুখ যে মোহরে ভর্তি। হাত পা নেড়ে বোবার মতো কি সব বোঝাতে চেষ্টা করলো সে। হয়তো বোঝাতে চাইলো : আমি টাকা পয়সা কোথায় পাব? আমি তো কাঠের পুতুল। পুতুলের কি কখনো ধন-সম্পদ হয়?

এসব আকার-ইঙ্গিত অনুনয়-বিনয়ে গুণ্ডাদের বিশ্বাস হলো না। কেমন পিট পিট করে তাকাচ্ছিলো। ওদের এমন গোলগাল দেখাচ্ছে কেন? ওরা কি তবে বস্তার ভেতরে প্রবেশ করেছে নাকি? চোখের ভেতর তো মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে।

মেজাজের ভোল্টেজ আরো বেড়ে গেল গুণ্ডাদের।

–সময় নষ্ট করো না বলছি। যা আছে সব দিয়ে দাও।

পিনোকিও যথারীতি মাথা ঘাড় ও হাত নেড়ে জানালো যে তার কাছে কিছুই

নেই। অপর গুণ্ডা একটা ধাক্কা দিয়ে পিনোকিও-কে রাস্তার পাশে ফেলে দিলো। চিৎকার করে বললো :

–এবার টাকা না দিলে তোকে তো মারবোই, তোর বাপকে শুদ্ধ খতম করে ফেলবো।

বাবার কথায় মনটা যেন কেমন করে উঠলো পিনোকিও-র। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো :

–খবরদার আমার বাবাকে...

কথা বলতে গিয়েই মুখের ভেতর মোহরগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠলো। তারপর দুই গুণ্ডা মিলে পিনোকিও-র মুখ খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মুখ হাঁ করাতে পারলো না। অবশেষে একটা গুণ্ডা রাম দা'র মতো একটা লোহার অস্ত্র পিনোকিও-র মুখে ঢোকানোর চেষ্টা করলো। পিনোকিও তখনই সেই গুণ্ডার হাত কামড়ে একদম ছিঁড়ে ফেললো। অতি সাবধানে থু থু ফেলে সেই হাত মাটিতে ফেলতে গিয়ে দেখলো : এতো মানুষের হাত নয়। একটা বিড়ালের পা ধপাস করে পড়লো। খুব খুশি হলো সে।

কিন্তু যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয় নি। আর যুদ্ধ করে এই দুই ডাকাতের সঙ্গে পারবে বলেও তো মনে হচ্ছে না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো এখান থেকে দৌড়ে

পালাতে হবে। ভাবতে যতোটুকু সময়। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো সে।

গুণ্ডারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারাও প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পিনোকিও একটা গাছে উঠে বসলো। গুণ্ডারাও গাছে ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু অর্ধেক উঠেই আবার ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। গুণ্ডা দুটি অবশেষে কতোগুলো খরকুটো জোগাড় করে গাছের নিচে আগুন ধরিয়ে দিলো। এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেলো পিনোকিও। তার যে কাঠের শরীর। একেবারে শুকনো কাঠের। আগুন যেভাবে এদিকে তেড়ে আসছে তাতে তো আর গাছে বসে থাকা সম্ভব নয়। এক লাফে মাটিতে পড়েই ধানক্ষেত-গমক্ষেত-আলুক্ষেত-পটলক্ষেতের ভেতর দিয়ে আবার দৌড়াতে লাগলো।

গুণ্ডারাও আবার পিনোকিও-কে ধাওয়া করতে লাগলো। পিনোকিও দৌড়াতে দৌড়াতে দেখতে পেলো সামনে একটা খাল নালার মতো। বেশ চওড়া ও গভীর মনে হচ্ছে নালাটা। কি করবে ভেবে দেখার সময় নেই। এক লাফে সে চলে গেল খালের ওপারে।

গুণ্ডারাও লাফিয়ে খাল বা নালা পাড়ি দিতে চেষ্টা করলো। ওদের কপাল মন্দ। তাই পড়লো গিয়ে একেবারে খালের মাঝখানে। আর খালের জল এমনই নোংরা ছিলো যে, একে তো দুর্গন্ধ, তার ওপর শরীরে চুলকানি শুরু হলো। পিনোকিও আনন্দে খালের পাড় থেকে হাত তালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলতে লাগলো:

*গুণ্ডামি আর করবি?*
*নোংরা জলে মরবি।*
*নর্দমার এই জল খা*
*বাপের নাম ভুলে যা।*

পিনোকিও নাচছে তো নাচছেই। এদিকে ডাকাত দুইটি নোংরা জলে সাঁতার কেটে তীরে উঠে এসেছে। বস্তা ভিজে কি যে অদ্ভুত হয়েছে দেখতে! খুব হাসি পেলো গুণ্ডাদের অবস্থা দেখে। কিন্তু হাসার সময় এটা নয়। ওরা আবার দৌড়াতে শুরু করেছে। পচা পানিতে নাকানি চুবানি খাওয়ায় সারা শরীর তাদের

চুলকাচ্ছে। এবার আর দৌড়ে তেমন সুবিধে করতে পারছে না তারা। ভিজে শরীরে কতো আর দৌড়ানো যায় বলো?

পিনোকিও কিন্তু থেমে নেই। দৌড়ায় আর পিছন দিকে তাকিয়ে ডাকাতের অবস্থান দেখে। কপালে যা থাকে, তাকে দৌড়াতেই হবে। এই গুণ্ডাদের হাতে ধরা পড়লে চলবে না।

## পনেরো

*পিনোকিও যেদিক যায়*
*গুণ্ডা দুটো সেদিক ধায়।*
*অবশেষে পড়লো ধরা*
*করবে কি আর নড়াচড়া?*
*আম গাছে এক রশিতে*
*ঝুলিয়ে দিলো ফাঁসিতে।*

কতো আর দৌড়ানো যায় বলো! শরীরের শক্তি তো ফুরিয়ে এসেছে। পিনোকিও ভাবলো এবার হয়তো হারই মানতে হবে। ধরা দিতে হবে এই দস্যুদের হাতে। এমন দুর্বল লাগছিলো যে ইচ্ছে হলো এখনই মাটিতে শুয়ে পড়ে। মহাবিপদ দেখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো সে। একটু দূরে ঘন সবুজের মধ্যে সাদা একটা ঘর দেখতে পেলো। বরফের ঘর হবে হয়তো। এমন সাদা ঘর তো সে কোনোদিন দেখে নি। পিনোকিও সেই ঘরের দিকে ছুটে চললো। পিছনে ছুটছে গুণ্ডারা। এতো শক্তি ওরা কোথায় পেলো? ছুটতে

ছুটতে কাঠের পুতুল সেই বরফের ঘরের কাছে এসে পৌঁছালো। পিনোকিও কড়া নাড়লো। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার কড়া নাড়লো। কেউ দরোজা খুলে দিলো না। এবার সে রাগে এবং দুঃখে দরোজায় লাথি মারতে শুরু করলো। ডাকাতেরা খুব কাছে চলে এসেছে। তাদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এবার সে লাথি মারতে মারতে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো :

–ভেতরে কে আছেন? দয়া করে আমাকে বাঁচান।

বরফ ঘরের দরোজা বন্ধ থাকলেও একটি জানালা খুলে গেল। ভেতরে দেখা গেল এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। তার চুল গাঢ় নীল। আর শরীর এমন ফর্সা যে ভেতরের রক্ত হাড় সবকিছু দেখা যায়। পিনোকিও ভাবলো : এ কোনো রাজকন্যা না হয়ে যায় না। ঘরের জানালা খুললেও রাজকন্যা কিন্তু চোখ খুলছে না। আর হাত দুটোও ক্রুশের মতো করে বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। সে কথা বলছে কিন্তু ঠোঁট নড়ছে না। কি গভীর আর মৃদু আর শীতল তার কণ্ঠস্বর! বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো পিনোকিও-র। রাজকন্যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো সে।

–আমাকে বাঁচান। আমাকে গুণ্ডায় ধাওয়া করেছে।

–এই ঘরে কেউ নেই। এখানে সবাই মৃত। সবাই লাশ।

–আপনি তো বেঁচে আছেন। আপনিই আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিন।

–আমিও মৃত। আমি অনেক আগেই লাশ হয়ে গেছি।

–মরে গেলে মাটির নিচে চলে যান। এখানে কেনো?

–অপেক্ষা করছি।

–কিসের অপেক্ষা? কি চাই আপনার?

–একটা বাক্স।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই রাজকন্যা। বন্ধ হয়ে গেল জানালা। কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। পিনোকিও অনেক অনুনয় বিনয় করে বললো :

–দোহাই লাগে রাজকন্যা, এভাবে চলে যাবেন না। দয়া করে আমাকে ভিতরে আসতে দিন।

পিনোকিও বরফের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রাজকন্যাকে ডাকছে আর এদিকে

পেছন থেকে গুণ্ডারা এসে তাকে পাকড়াও করেছে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে গুণ্ডারা বলতে লাগলো :

–এখন কোথায় যাবে সোনার চান? অনেক জ্বালিয়েছো।

রাজকন্যার অদৃশ্য হওয়ার ঘটনায় এমনিতেই তার শরীরে কাঁপন ধরেছে। তার ওপর গুণ্ডাদের হাতে সে এখন বন্দী। ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে টকটক ঠকঠক আওয়াজ বের হচ্ছিলো। তার সঙ্গে সোনার মোহরের শব্দ যুক্ত হয়ে খুবই মিষ্টি সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছিলো। অবশ্য যন্ত্রসঙ্গীত।

বন্ধুরা, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। পিনোকিও চারটি সোনার মোহর মুখের ভেতর পুরেই হাজার হাজার মাইল পার হয়ে এই নীলকেশী রাজকন্যার বরফ ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

গুণ্ডারা এবার মুখ খুলে সোনার মোহর বের করে নেবে। কিন্তু কিভাবে নেবে? পিনোকিও মুখ খুললে তো!

অনেক চেষ্টা করেও যখন মুখ খোলাতে পারলো না তখন মুখের ভেতর শক্ত এক লোহার রড বা ছুরি জাতীয় একটা জিনিস প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। মজার ব্যাপার হলো, পিনোকিও-র মুখ খুলতে তো পারলোই না গুণ্ডাদের ছুরিই গেল ভেঙে। তোমরা তো জানোই পিনোকিও হলো শক্ত মজবুত শক্তিশালী এবং দুষ্টু এক কাঠের পুতুল। গুণ্ডারা তো অবাক! এখন উপায়? তবে কি মোহর না নিয়েই একে ছেড়ে দিতে হবে?

না। এতো সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় ডাকাতেরা। হাঁ করানোর জন্য পিনোকিও-কে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে আম গাছের শক্ত ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলো।

ওরা ভাবলো : মরে গেলেই মুখ খুলে যাবে। আর মুখ থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়বে সোনার মোহর।

ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ওরা পিনোকিও-র মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা চলে গেল। পিনোকিও-র মরার নাম নেই। কেবল হাত-পা নাড়াচ্ছে আর 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করছে।

গুণ্ডারা ভাবলো :

–এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ডাকাত দল পিনোকিও-

কে গাছে ঝুলিয়েই 'আগামীকাল আবার দেখা হবে' বলে চলে গেল।

গুণ্ডারা বিদেয় হলে শুরু হলো নতুন ঝামেলা। ঝড়ের বেগে বাতাস বইতে লাগলো। পিনোকিও-র ঝুলন্ত দেহ এপাশ থেকে ওপাশে, এ-গাছ থেকে ও-গাছে গিয়ে ধুরুম-ধারুম করে পড়তে লাগলো। এভাবে আঘাত খেতে খেতে পিনোকিও-র জিহ্বা ক্লান্ত কুকুরের মতো দেড় হাত বাইরে চলে এলো। দুচোখে অন্ধকার দেখলো সে। এখনই বুঝি তার প্রাণপাখি ফুরুত করে উড়ে যায়। চিৎকার করার শক্তি নেই। এই নির্জন বনে কে তাকে উদ্ধার করতে আসবে?

বেচারা কাঠের পুতুলের এবার বাবার কথা মনে পড়লো। বাবার অবাধ্য হওয়ায়

আজ তার এই অবস্থা। বাবা কাছে থাকলে কি আর তাকে ফাঁসিতে ঝুলে জীবন দিতে হয়! কিন্তু আর ভাবতে পারলো না সে।

*বাবা তুমি কোথায় র'লে*
*একবার দেখে যাও*
*তোমার ছেলে ঝুলছে গাছে*
*মাফ করে দাও।*

আর কিছু ভাবতে পারলো না সে। বলতে বলতে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। খুলে গেল তার বন্ধ মুখ। এই মুখ খোলার জন্য গুণ্ডারা কতো চেষ্টাই না করেছে!

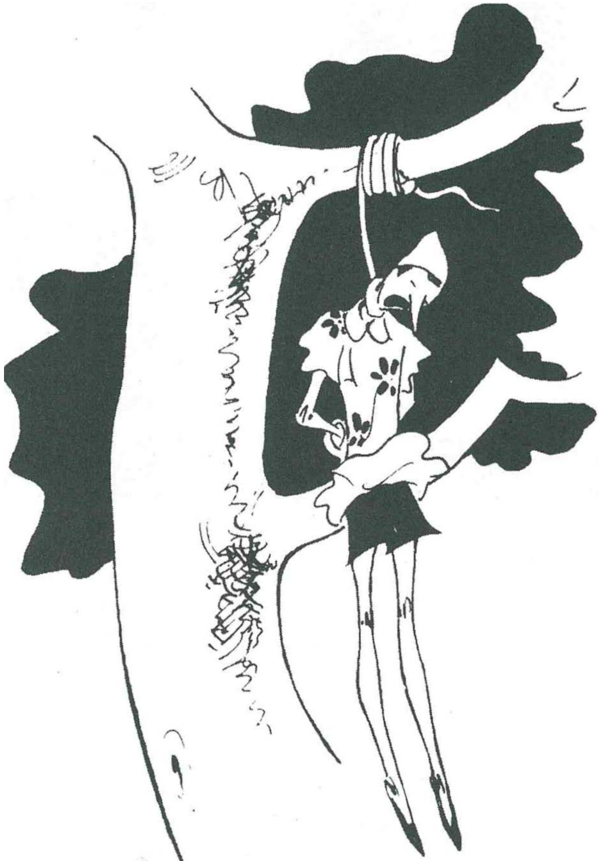

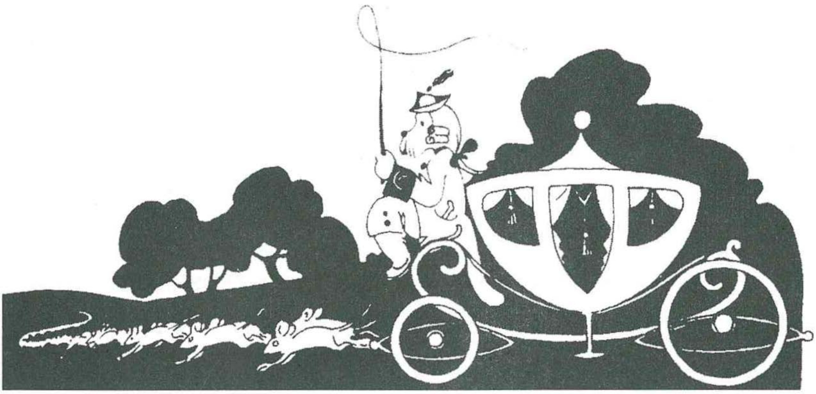

## ষোল

*পিনোকিও ঝুলছে সেই আম গাছে*
*আত্মীয় পরিজন নেই কেউ কাছে।*
*তাই দেখে নীলকেশী বললো ডেকে,*
*'ছুটে যাও এক্ষুনি নিয়ে এসো একে'।*
*তারপর তিনজন ডাক্তার এলো*
*অবশেষে পিনোকিও সুস্থ হলো।*

অসহায় পিনোকিও যখন গভীর জঙ্গলে আম গাছে ঝুলছে, তখন সেই নীলকেশী রাজকন্যে আবার জানালায় এসে দাঁড়ালো। গাছপালা যতোই গভীর এবং ঘন হোক না কেন, তার চোখ কিন্তু প্রথমেই গেল সেই ঝুলন্ত পিনোকিও-র দিকে। খুব মায়া হলো তার। সে শুধু জানালা দিয়ে তার হাতটা বাইরে রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান চিল উড়ে এসে তার হাতে বসলো। চিল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কুর্নিশ করে বললো :

আদেশ করুন পরীর রানী। আমাকে কী করতে হবে?

বন্ধুরা, তোমরা মন দিয়ে শুনছো তো? সেই সুদর্শন চিলটা তাকে পরীর রানী বলে ডাকছে। সত্যিই তাই। পরীর রানী। অর্থাৎ পরী। এই বনে সে বাস করছে অনেক বছর ধরে। তিন চার হাজার বছর তো হবেই। হয়তো আরো বেশি।

নীলকেশী হুকুম দিলো :

–সোজা পশ্চিম দিকে তাকাও। দেখো একটা পুতুল আমগাছে ঝুলছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো?

–হ্যা দেখতে পাচ্ছি পরীর রানী।

–এখনি উড়ে গিয়ে ওর গলার দড়ি কেটে দাও। তারপর আরাম করে নরোম সবুজ ঘাসের ওপর শুইয়ে দাও।

চিল উড়ে গিয়ে পিনোকিও-কে মুক্ত করে ঘাসের ওপর শোওয়ালো। বুকে কান পেতে বেঁচে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর ফিরে এলো পরীর রানীর কাছে :

–আদেশ পালন করেছি রানী।

–পুতুলের কী অবস্থা

–নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এ-ব্যাপারে চিকিৎসকই ভালো বলতে পারবেন রানী।

পরীর রানী এবার শিস বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান শিয়াল এসে হাজির হলো। মাথা নিচু করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো :

–আদেশ করুন পরীর রানী। আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়।

শিয়ালের পোশাক দেখে মনে হলো তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মাথায় লোহার বর্ম। পায়ে লোহার জুতো। দুজনের হাতেই ঝকঝক করছে ধারালো তলোয়ার। এমন কি লেজটাও এমন চকচকে চামড়া দিয়ে মোড়ানো যে যখন লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছিলো তখন মনে হচ্ছিলো ও-দুটো যেন লেজ নয়, ক্ষেপণাস্ত্র।

পরীর রানী হুকুম দিলেন :

–একটা গাড়ি নিয়ে বনের ভেতরে যাও। আমগাছের তলায় সবুজ চত্বরে শুয়ে থাকা পুতুলটাকে হাওয়ার বালিশে শুইয়ে আমার কাছে নিয়ে আসো।

ঝড়ের বেগে ছুটে গেল শিয়াল দুটি। গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল। আড়াই শ' সাদা ইঁদুর টেনে নিয়ে চললো হাওয়ার গাড়ি। এমন সুন্দর গাড়ি এই পৃথিবীতে তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না। এমন গাড়ি হয়তো কেবল স্বর্গেই পাওয়া

সম্ভব। গাড়ি যেন ভেসে যাচ্ছে বাতাসের ঘাড়ে চড়ে। আর শিয়াল চালকের আসনে বসে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

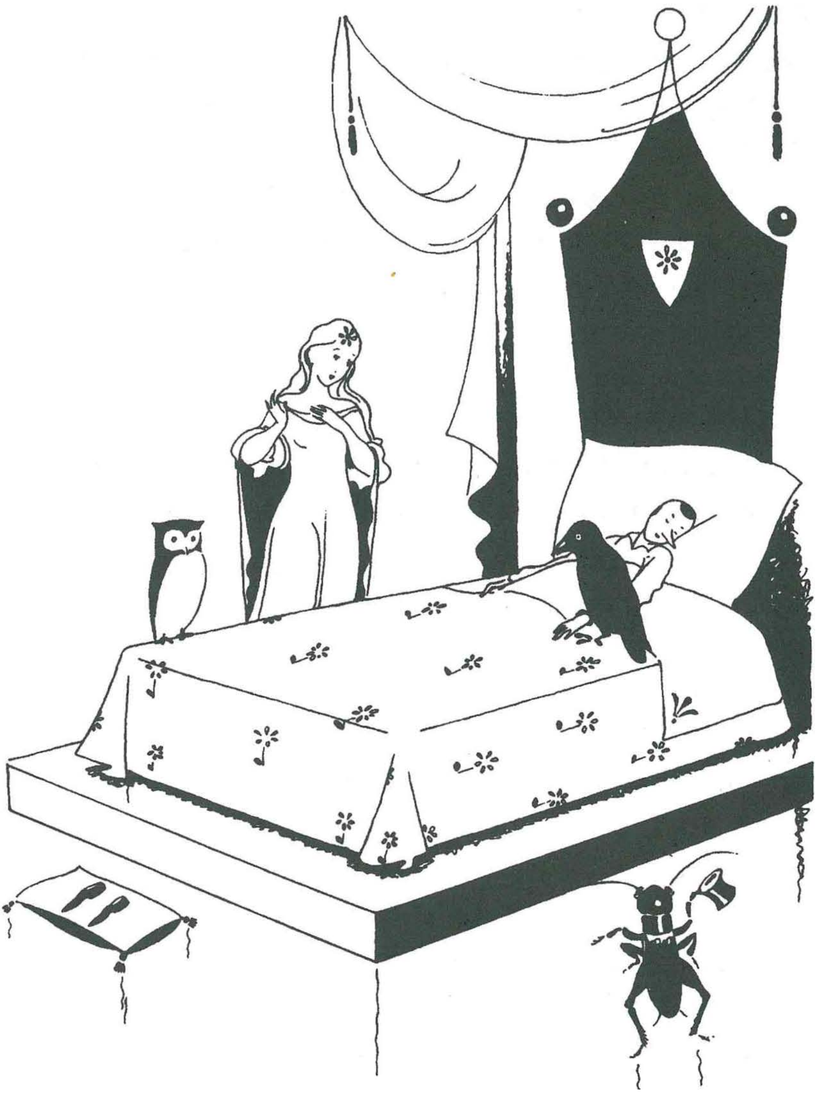

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঠের পুতুলকে নিয়ে সেই হাওয়ার গাড়ি পরীর রানীর কাছে চলে এলো। পরীর রানী কাঠের পুতুলকে কোলে নিয়ে একটি সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করলো। আহা কি সুন্দর ঘর! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনটা সুন্দর ও পবিত্র হয়ে যায়।

পরীর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের খবর দেয়া হলো। তারা সবাই যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতে লাগলেন। যিনি হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ তার নাম মিস্টার হৃদয়ভূষণ। তিনি বললেন :

–হৃদ্‌পিণ্ডের যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে প্রাণবায়ু উড়ে গেছে। এই বায়ু যদি আবার ফিরে আসে তাহলে বেঁচে যাওয়াও অসম্ভব নয়। হাড়ের চিকিৎসায় যিনি পারদর্শী তার নাম মিস্টার হাড্ডিসার। তিনি অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করলেন :

–হাড়ের বাঁকে বাঁকে ঝড়ের হাতুড়ি পড়েছে। যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে খুঁড়িয়ে হাঁটবে। আর যদি না ভেঙে থাকে তাহলে আগের মতোই হাঁটবে। তবে বাঁচবে কি-না তা বলা সম্ভব নয়।

একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞও এসেছেন। তার নাম মিস্টার মনোরঞ্জন। তিনি খুচিয়ে খুচিয়ে মনের অলিগলি পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন :

–ঝড়ের আঘাতে মনটা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। তবে ভালো সিমেন্টের ব্যবস্থা করা গেলে জোড়া লাগানো যেতে পারে। অবশ্য সুপার গ্লু দিয়ে আপাতত কাজ চালানো যায়। মনের জোড়া লাগা পর্যন্ত এই পুতুল বেঁচে থাকবে কিনা এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ফাঁসির কারণে যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে আর বাঁচার আশা নেই।

ঘরের পাশ দিয়েই একটা ঝিঁঝিঁ পোকা যাচ্ছিলো। ডাক্তারদের কথাবার্তা আর পরামর্শ শুনে ভেতরে ঢুকলেন। পরীর রানী তাকে স্বাগত জানালেন। অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে বললেন :

–একটু ভালো করে দেখুন তো ডাক্তার ঝিঁ ঝিঁ। বিশেষজ্ঞদের মতামতে পরিস্থিতি আরো জটিল এবং ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি একটু সহজ করে রুগীর অবস্থাটা বলতেন।

ডাক্তার ঝিঁঝিঁ কাঠের পুতুলের হাত চোখ ও জিহ্বা পরীক্ষা করে বললেন :

–এতো আমার অনেক দিনের পরিচিত।

একথা শুনে পিনোকিও একটু নড়েচড়ে উঠলো। পরীর রানীর চোখ আনন্দে নেচে উঠলো যেন।

ডাক্তার ঝিঁঝিঁ আবার বললেন :

–এই কাঠের পুতুলের নাম পিনোকিও। আমি ওর বাবাকেও চিনি। এই ছোকরা খুবই অবাধ্য আর দুষ্টু। এর বুড়ো বাবা বোতল মিয়াকে ও খুবই কষ্ট দিয়েছে। কান্নাকাটি করে বাবাকে কারাগারে পর্যন্ত পাঠিয়েছে। এমন দস্যি ছেলে আর হয় না।

বাবার কথা মনে পড়তেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো পিনোকিও। এই কান্নার শব্দে ঘরের সবাই অবাক বিস্মিত আর আনন্দিত। সবচেয়ে খুশি পরীর রানী। কিন্তু ডাক্তাররা আবার নানা বিতর্কে জড়িয়ে গেল। বিতর্ক যখন ঝগড়া আর মারামারিতে রূপ নিচ্ছিলো তখনই পরীর রানী ডাক্তারদের যথাযথ সম্মানী দিয়ে বিদায় করলো।

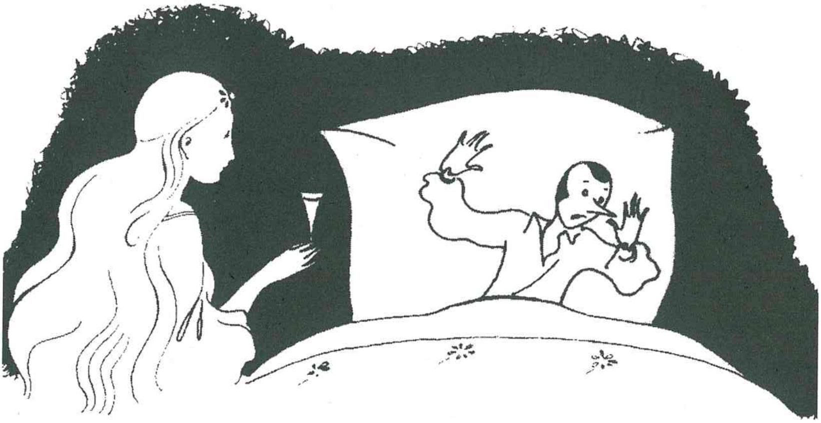

## সতেরো

*পিনোকিও-র প্যানপ্যানানি বাড়ে প্রতিদিনই*
*ওষুধ খেতে ভাল্লাগে না খায় সে কেবল চিনি।*
*কফিন এনে ভয় দেখালে ওষুধ যদিও খায়*
*মিথ্যে বলার কারণে নাক লম্বা হয়ে যায়।*

পরীর রানী নিজে পিনোকিও-র সেবাযত্নের দায়িত্ব নিলেন। সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, মাথায় পানি দেওয়া, তোয়ালে ভিজিয়ে গা মুছে দেওয়া– সবই নিজে করতে লাগলো। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বরে শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে পিনোকিও-র। হাতটা ওর কপালে রাখতেই টের পেলো ভীষণ জ্বর উঠেছে। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাবলেট এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে জলের গেলাস তুলে নিলেন। অত্যন্ত আদর করে দরদ ভরা গলায় বললো :

–একটু উঠে বসো তো সোনামণি। এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

তারপর সুর করে বললো :

*ওষুধ খেলে অসুখ যায়*
*আমার সোনা ওষুধ খায়*

পিনোকিও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল। ওষুধ তিতে হলে সে কিছুতেই খাবে

না। এতো আবদার আর আহ্লাদ তার। শুনে তোমরা হাসবে। ওষুধ খাওয়ানোর জন্য পরীর রানী তারে কোলে নিতে চাইলো। কিন্তু পিনোকিও বললো :

*তোমার কোলে যাবো না*
*তিতে ওষুধ খাবো না*

তিতে ওষুধ তার একদম অপছন্দ। চিনি ওর খুব পছন্দ। তাই চিনির লোভ দেখিয়ে বললো :

–এই ওষুধ খেলে তোমাকে চিনি খেতে দেবো সোনা। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, ওষুধটা খেয়ে নাও।

–আগে চিনি দাও পরে খাবো।

পরীর রানী চিনি দিলে কেবল চিনিটাই খেলো। ওষুধ রয়ে গেল রানীর হাতে।

এভাবে প্রতিদিন পিনোকিও নানা অজুহাত ও নানা ঝামেলা-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। সময়মতো ওষুধ খেতে চায় না। কিন্তু চিনি না হলে তার চলে না। মনে হলেই গানের সুরে চিনির কথা বলে :

*এখন আমি চিনি খাবো*
*পরী মা'র কোলে যাবো।*
*চিনি যদি ওষুধ হয়*
*ওষুধ খাওয়া মন্দ নয়।*

পরীর রানী রাগও করেন আবার আনন্দও পান। যখন একেবারেই কথা শোনে না তখন ভয় দেখাতে হয়। নানা জিনিসের ভয়। পরীর রানী বললো:

–এই ওষুধটা খেলে তোমাকে একটা মজার গান শোনাবো। পরীর দেশের গান।

–ওই তিতে ওষুধ খাওয়ার পর মিষ্টি গানও তিতে মনে হবে। আগে গান গাও। পরে ওষুধ খাবো।

পরীর রানী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো :

–কে আছিস বাইরে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে চারটি খরগোশ কাঁধে করে একটা কফিন নিয়ে হাজির।

খরগোশগুলো একযোগে সুর করে বললো :

*হাত-পা বেঁধে তুলবো ঘাড়ে*
*নিয়ে যাবো একেবারে।*
*যেথায় মরা মানুষ থাকে*
*পরীশ্বরী নদীর বাঁকে।*

এখনো সময় আছে। যদি মরার দেশে যেতে না চাও তো ওষুধ খেয়ে নাও। ওষুধ খেলে সুস্থ হয়ে উঠতে। আর মরতে হতো না। কথা যখন শুনছো না তবে

মরার দেশেই চলো। বলেই পিনোকিও-কে কফিনে তুলতে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে পিনোকিও পরী-মার হাত থেকে ওষুধ নিয়ে পানি দিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললো।

খরগোশগুলো কফিন নিয়ে বিদায় হয়।

ওষুধ খেয়ে গায়ে যেন-বা শক্তি ফিরে আসে। আনন্দে লাফাতে শুরু করলো সে। নাচতে নাচতে এবং ডিগবাজি খেতে খেতে বললো :

–দেখো পরী-মা আমি এখন সুস্থ হয়ে গেছি।

*আমার আর অসুখ নাই*
*মনের সুখে গান গাই।*
*তাইরে নাইরে তা-না*
*চিনি দাও পরী-মা।*

পরীর রানী খুশিতে হাসতে হাসতে পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

এভাবে ওষুধ পথ্যি আর আদর যত্নে পিনোকিও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে। একদিন পরীর রানী পিনোকিও-র কাছে জিজ্ঞেস করেন :

–বলো তো পুতুল সোনা, তুমি কিভাবে সেই গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিলে।

পিনোকিও একে একে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। পুতুল নাচের মাস্টার মুটোর কাছে কিভাবে সে পাঁচটি সোনার মোহর পেয়েছিলো তা বললো। তারপর নেকড়ে বাঘ ও অন্ধ বিড়ালের ভণ্ডামির বর্ণনা দিলো। হোটেল থেকে বের হয়ে যেসব ঝামেলা হয়েছিলো বললো। গুণ্ডাদের ভয়ে কিভাবে সোনার মোহরগুলো মুখের ভেতর রেখে তা রক্ষা করেছে তা বলতে বলতে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করতেও ভুললো না।

পরী এবার জিজ্ঞেস করলেন :

–সেই সোনার মোহরগুলো এখন কোথায় বাবা?

–তা আমার মনে নেই পরী-মা। হয়তো হারিয়ে ফেলেছি।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিনোকিও-র নাক লম্বা হতে শুরু করলো। কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো বন্ধুরা। মিথ্যে বললেই পিনোকিও-র নাক লম্বা হয়ে যায়। কারণ মোহরগুলো তখনো তার কাছেই ছিলো।

পরীর রানী জানতে চাইলেন :

–এতো দামী মোহরগুলো তুমি কোথায় হারালে?

–আমার তো কিছুই মনে নেই। জঙ্গলের সেই আমগাছ তলাতেই হয়তো হবে।

নাকের দৈর্ঘ্য আরো কয়েক ইঞ্চি বাড়লো।

পরীর রানী বললেন :

–তাহলে লোক পাঠিয়ে দিই। ওগুলো খুঁজে নিয়ে আসুক।

–না পরী-মা। মোহরগুলো তো মুখে ছিলো। হয়তো ওষুধের সাথে খেয়ে ফেলেছি।

তৃতীয়বার মিথ্যে বলার কারণে পিনোকিও নাক বেড়ে গেল আরো কয়েক ইঞ্চি। অবস্থা এমন হলো যে ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করাই কষ্টকর হয়ে গেল।

দরোজায় জানালায় চৌকাঠে নাক ধাক্কা খাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে পরীর রানীর কি যে আনন্দ। পুতুলকে রাগানোর জন্য ওর মতো করেই ছড়া কাটলেন রানী:

*পুতুল সোনার লম্বা নাকে*
*ঘরের ভেতর বসে থাকে।*
*নাওয়া খাওয়া বন্ধ*
*আহা কি আনন্দ!*

পিনোকিও খুব চিন্তায় পড়ে গেল। এখন উপায় কি? এই লম্বা নাকে তো হাঁটা চলাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বেহাল দশা দেখে খুব মায়া হলো পরীর রানীর। তখন সে বুঝিয়ে বললেন :

–শোনো পুতুল সোনা। তোমার নাক লম্বা হওয়ার কারণ মিথ্যে বলা। তুমি যতোবার মিথ্যে বলেছো ততোবারই তোমার নাক একটু একটু করে লম্বা হয়েছে। মিথ্যে বলা খুব অন্যায়। মিথ্যে বললে নিজের মুখের সৌন্দর্য ও লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। তুমি তো আমাকে পরী-মা বলে ডাকো। মায়ের কাছে মিথ্যে বলা অনেক বড়ো অপরাধ।

এসব কথা শুনে খুব লজ্জা পেলো পিনোকিও। পরী-মার চোখের দিকে আর তাকাতে পারলো না। ঘর থেকে দৌড়ে পালাতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এই নাক নিয়ে তো আর মানুষকে মুখ দেখানো যায় না।

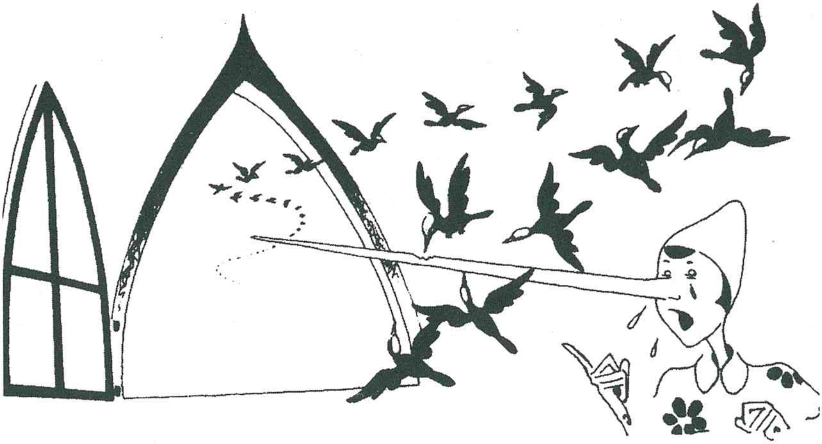

## আঠারো

*নেকড়ে বাঘের কানে কানে ভণ্ড বিড়াল বলে*
*কোনো রকম কাজ ছাড়া জীবন কি আর চলে?*
*পিনোকিও-র খোঁজে তারা বাহির হলো পথে*
*বাকি সোনার মোহরগুলো নেবে কোনোমতে।*

নাক নিয়ে নাকানি-চুবানি খেয়ে বেচারা পিনোকিও যথেষ্ট নাজেহাল হলো। লজ্জায় পরী-মাকেও কিছু বলতে পারছে না সে।

পরীর রানী সব বুঝেও কিছু বললো না। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। মিথ্যে বলার শাস্তিটা ওর লম্বা নাকের মতোই লম্বা হওয়া উচিত। তাতে ওর মিথ্যে বলার ইচ্ছেটা দুর্বল হবে।

পিনোকিও যখন কান্না আর আড়াল করতে পারছিলো না তখন পরীর রানীর খুব মায়া হলো। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু শিস দিলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো এক ঝাঁক কাঠ-ঠোকরা পাখি। ঘরে ঢুকেই পরীর রানীকে সম্ভাষণ করে জানতে চাইলো :

—এই দরিদ্র শ্রমিক পাখিদের আপনি কেনো স্মরণ করেছেন পরীর রানী? আমাদের হুকুম করুন। আমরা কাজে লেগে যাবো।

–আমার পুতুল সোনার নাকটা কেটে আগের মতো সুন্দর স্বাভাবিক করে দাও।

–আমরা এক্ষুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি রানী।

বলেই সবাই পিনোকিও-র নাকের ডগায় বসে কাঠ-ঠোকরারা কাঠ কেটে খেতে লাগলো। সে যে কি চমৎকার দৃশ্য! তোমরা একটু কল্পনা করে দেখো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিনোকিও তার সুন্দর নাক ফিরে পেলো। তার আনন্দ আর ধরে না। নেচে নেচে গেয়ে উঠলো :

*নাকের ডগায় বসলো পাখি*
*দেখলো আমার পরী-মা কি?*
*কাঠ-ঠোকরার ঠুক্ ঠাক্*
*হয়ে গেলো সুন্দর নাক।*

আনন্দে পরীর রানীকে জড়িয়ে ধরলো সে। কপালে চুমু খেতে খেতে বললো :

–তুমি খুব ভালো পরী-মা। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

–আমিও বাসি। তুমি আমার পুতুল সোনা। তুমি চাইলে সারাজীবন আমার কাছে থাকতে পারো। সারা জীবনই আমি তোমাকে আদর করবো, ভালোবাসবো।

বলেই আদর করে পিনোকিও-র নাকটা টেনে দিলেন পরী।

–আমার তো থাকতেই ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তুমিই বলো পরী-মা, আমি ঘরে ফিরে না গেলে আমার বাবার কি হবে?

–তুমি চাইলে তোমার বাবাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি। তাকে অবশ্য খবর দেয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো পৌঁছে যাবেন।

–সত্যি বলছো পরী-মা! তুমি খুব ভালো।

বলেই পরী-মার কপালে একটা চুমু খেলো পিনোকিও। কিন্তু এই আনন্দ তার মনকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। সে এখনই তার বাবার কাছে যেতে চায়। কতোদিন বাবাকে দেখে না সে। মনের ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পরীর রানীকে বললো :

–বাবার জন্য মন কেমন করে পরী-মা। আমি এখনই বাবার কাছে যেতে চাই। অবশ্য তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলেও খুব খারাপ লাগছে। আমাকে দেখতে

না পেয়ে না জানি বাবা কতো কান্নাকাটি করেছে। কতো খোঁজাখুঁজি করেছে। আমাকে অনুমতি দাও পরী-মা।

–বাবার কাছে যেতে চাও সেতো খুব ভালো কথা। আনন্দের কথা। কিন্তু সাবধানে যেও বাবা। বনের মধ্যে আবার যেন বিপদে না পড়ো। সৃষ্টিকর্তা তোমার সহায় হোক।

পিনোকিও নাচতে নাচতে পরীর রানীকে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনের আনন্দে ছড়া কাটতে শুরু করলো :

*আজকে বাবার কাছে যাবো*
*সবার আগে চুমু খাবো।*
*আমার বাবা খুশি হবে*
*বুকের ভেতর জড়িয়ে নেবে।*

বনের ভেতর দিয়ে ছুটছে পিনোকিও। ছুটতে ছুটতে সেই আমগাছটার কাছে এলো। কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলো। খুব কাছে গিয়ে যা দেখলো তাতে তো পিনোকিও-র চক্ষু চড়ক গাছ।

বন্ধুরা, তোমাদের সেই খোঁড়া নেকড়ে বাঘ আর অন্ধ বিড়ালের কথা মনে আছে তো?

এই দুই ভণ্ড বন্ধু বেরিয়ে এসে পিনোকিও-কে সম্ভাষণ করলো।

–আপনার কল্যাণ হোক পিনোকিও সাহেব।

–আপনাদেরও। কিন্তু আপনারা এখানে?

–আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আজ আমরা এখানে এসেছি। ভাগ্য ভালো যে আপনাকে পেলাম। সেদিন হোটেল থেকে না বলে চলে যাওয়ায় খারাপ লাগছিলো। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আপনাকে খুঁজে বের করে মাফ চাইবো। এবার বলুন তো পিনোকিও সাহেব, আপনি এখানে এলেন কিভাবে?

পিনোকিও সমস্ত ঘটনা নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালকে খুলে বললো। গুণ্ডার হাতে হেনস্তা হয়ে ফাঁসিতে ঝোলা থেকে পরীর রানীর আশ্রয়ে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলো না।

নেকড়ে বাঘ ও বিড়াল পুরো ঘটনা শুনছিলো আর 'আহা আহা' 'হায় হায়' 'বলেন কি' 'কি আশ্চর্য কথা' ইত্যাদি উচ্চারণ করছিলো।

হঠাৎ পিনোকিও-র চোখ পড়লো বিড়ালের দিকে। নেকড়ের মতো অন্ধ বিড়াল যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জানতে চাইলো :

–বিজ্ঞ বিড়ালের এ দশা কেনো? কেমন করে কোথায় পা হারালো, দয়া করে বলবেন কি?

নেকড়ে বাঘ দেখলো বিড়ালের বোকামির কারণে নিজেদের ভণ্ডামি এবং গুণ্ডামি ধরা পড়ে যাবে। তাই বিড়ালকে বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই একটা চমৎকার গল্প বানালো :

–জানেন তো পিনোকিও সাহেব। আমরা অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। কারো ক্ষুধা, কারো কান্না, কারো দারিদ্র্য আমরা সহ্য করতে পারি না। ঘণ্টাদুয়েক আগে এক বুড়ো সিংহের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। বেচারা সিংহ খিদের জ্বালায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। আমাদের কাছে দুহাত বাড়িয়ে কিছু খাবার ভিক্ষা চাইলো। তখন কি করি বলুন তো? কি খেতে দেবো তাকে? ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দিলে অধর্ম হবে। তখন এই বিজ্ঞ ও দয়ালু বিড়াল

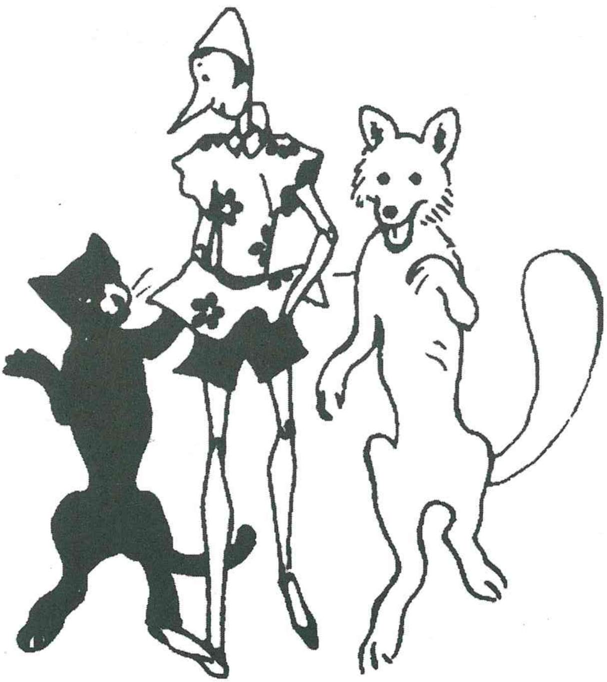

দাঁত দিয়ে তার সামনের ডান পা-টা কেটে সিংহকে খেতে দিলো। বেচারা সিংহ খাবার খেয়ে প্রাণ ভরে আমাদের জন্য দোয়া করলো।

পুরো গল্প শুনে বোকা পিনোকিও-র মনটা গলে গেল। মনে মনে ভাবলো : সত্যিই এমন ভালো বিড়াল আর হয় না।

নেকড়ে বাঘ জিজ্ঞেস করলো :

–আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন মিস্টার পিনোকিও?

–বাবার কাছে যাচ্ছি।

–আপনার সেই মোহরগুলো হারিয়ে যায় নি তো?

–হারায় নি। তবে একটা খোয়া গেছে। আপনাদের সামান্য আপ্যায়নের জন্য সেই হোটেল মালিককে দিতে হয়েছিলো।

পিনোকিও-র এই ঠাট্টা নেকড়ে ও বিড়াল হয়তো বুঝতেই পারলো না।

নেকড়ে বললো :

–টাকার কথা ভাববেন না। কাছেই তো ধনকুবেরের সেই মোহর ক্ষেত। ওখানেই গেলেই আপনি পেয়ে যাবেন হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

–দুঃখিত পরোপকারি নেকড়ে। আমি আজ ঐ মোহর ক্ষেতে যাচ্ছি না। আমি এখন আমার বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি।

–সে কি কথা! এতো কাছে এসে কেউ এমন বোকার মতো কাজ করে? বাবার কাছে এতো কম মোহর নিয়ে যেতে আপনার লজ্জা করবে না? এতো দিন পর বাবাকে দেখবেন। কমপক্ষে এক বস্তা সোনার মোহর তো নেওয়া উচিত।

ধূর্ত ও ধুরন্ধর দুই বন্ধু মিলে পিনোকিও-র মাথাটা আবার এলোমেলো করে দিতে লাগলো। পিনোকিও-র মনের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা লোভ আবার জেগে উঠলো। সব রকম চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে বললো :

–এতো করে যখন বলছেন, তবে আর দেরি কেন? চলুন। ধনকুবেরের দেশে গিয়ে মোহর ক্ষেতে গিয়ে মোহর চাষ করি। তারপর বাবার কাছে ফেরা যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এক আশ্চর্য দেশে এসে উপস্থিত হলো। এখানে সবকিছুই কেমন যেন উল্টাপাল্টা। পিনোকিও ভাবলো এটা হয়তো উল্টা রাজার দেশ দেবে। সে নেকড়েকে জিজ্ঞেস করলো :

–ধনকুবেরের দেশ আর কতো দূর?

–এই তো এসে পড়েছি জনাব। ঐ যে ঘন সবুজ একটা বনের মতো দেখতে পাচ্ছেন ওটাই হলো আমাদের ধনের দেশ। ওখানেই আমরা মোহর চাষ করবো।

আনন্দে নেচে উঠলো পিনোকিও। তাহলে তো এসেই পড়েছে তারা! কি আনন্দ! একটু গান গাইতে ইচ্ছে হলো তার :

*আমরা যাবো ধনের দেশে*
*করবো মোহর চাষ,*
*ধনী হয়ে ফিরবো শেষে*
*মিটবে মনের আশ।*

গান গাইতে গাইতে আর নাচতে নাচতে তারা পৌঁছে গেল মোহর ক্ষেতে। পিনোকিও এই ক্ষেত দেখে তেমন খুশি হতে পারলো না। আর দশটা ক্ষেতের মতোই দেখতে। আলু-পটল-ধান-গম-পাট-আখ ক্ষেত দেখতে তো এরকমই হয়। ক্ষেত দেখতে যেমনই হোক। ফসল নিয়ে কথা। বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়। তাই সময় নষ্ট না করে সে নেকড়ের কাছে জিজ্ঞেস করলো :

–এখন আমাদের কি করতে হবে?

–একটি গর্ত করে মোহরগুলো পুতে ফেলুন।

পিনোকিও মাটির ভেতর একটা গর্ত তৈরি করে ফেললো। তারপর সেই গর্তে মোহরগুলো রেখে মাটি চাপা দিলো।

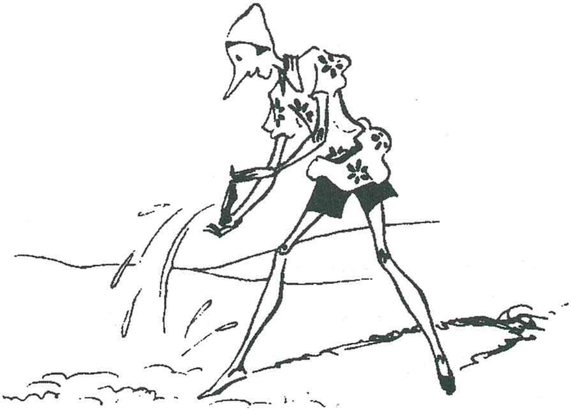

নেকড়ে তখন বললো :

–এবার যে এখানে পানি ঢালতে হবে পিনোকিও সাহেব।

–পানি কি দিয়ে আনি বলুন তো? একটা বালতি থাকলে বেশ হতো।

–একটা কাজ করুন। আপনার জুতো খুলে তার ভেতরে পানি এনে ঢালার চেষ্টা করুন। পানি ছাড়া তো গাছ জন্মাবে না।

পিনোকিও জুতো দিয়ে পানি এনে মোহরের ওপরের মাটিতে ঢালতে লাগলো। পুরো মাটিটা ভিজিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো :

–এখন কি করবো?

–আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখবেন এখানে বেড়ে উঠেছে মোহর গাছ। এটা দেখতে কিছুটা মানি প্ল্যান্ট-এর মতোই। তবে আরো শক্ত মজবুত এবং গুড়িবিশিষ্ট। গাছে পাতার পরিবর্তে দেখতে পাবেন হাজার হাজার মোহর। আপনি চাইলে এই গাছে উঠে ঝাঁকি দিয়েও মোহর সংগ্রহ করতে পারবেন।

পিনোকিও-র মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালকে বললো :

–আপনারা আমার জন্য অনেক করছেন। আমি আপনাদের সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করতে চাই।

দুষ্টু নেকড়ে ও ধুরন্ধর বিড়াল পিটপিট করে হাসলো। এবার অবশ্য বিড়ালই বিজ্ঞের মতো বলে উঠলো :

–আমাদের জন্য ভাববেন না সাহেব। আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেছি এতেই আমরা আনন্দিত। পরোপকারে যে সুখ, তার কোনো তুলনা হয় না। আপনি এবার নিজের ভাবনা ভাবুন।

বলেই পিনোকিও-র মোহর গাছের জন্য শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিলো তারা।

পিনোকিও সেই মোহর ক্ষেত থেকে একটু দূরে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে গেল। বটতলায় শুয়ে সে গুনগুন করে গাইতে লাগলো :

*মোহর গাছে সোনার মোহর ঝুলবে*
*পিনোকিও-র ভাগ্য এবার খুলবে।*

## উনিশ

*সোনার মোহর চুরি করে*
*ভণ্ড পালায় অন্যপারে*
*হতভাগা পুতুল ওরে*
*বন্দি হলো কারাগারে।*

বটতলায় শুয়ে পিনোকিও মনে মনে সোনার মোহরের হিসেব করতে লাগলো। মোহর দিয়ে সে কি করবে তারও একটা তালিকা তৈরি করলো। তার একটা সুন্দর বাড়ি হবে। অবশ্য একটা গাড়ি কেনারও পরিকল্পনা করলো সে। সে গাড়িটা হবে সেই হাওয়াই গাড়ির মতো যেটাতে চড়ে সে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পরী-মার আশ্রয়ে গিয়েছিলো। সুন্দর একটা লাইব্রেরিও তৈরি করার ইচ্ছে আছে তার। তবে সেই লাইব্রেরিতে বইয়ের পরিবর্তে থাকবে রসগোল্লা, জিলাপি, সন্দেশ, দানাদার, চমচম আরো অনেক মজার মজার খাবার।

*গাড়ি করে ঘুরতে যাবে*
*যখন খুশি মিষ্টি খাবে।*

এই সব ভাবতে ভাবতেই বোধ করি একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিলো তার। ঘুমের মধ্যেও সে স্বপ্নে সোনার মোহর দেখতে পেলো। একটা দুষ্টু পাখি সেই

বটগাছ থেকে একেবারে পিনোকিও-র মাথার ওপর একটা পাকা বেল ফেলে দিলো। ধরফর করে উঠে বসলো সে। প্রথমে ভাবলো মাথায় হয়তো মোহরই পড়েছে। কিন্তু পাশেই একটা ফাটা বেল দেখে তার ভুল ভাঙলো। তাড়াতাড়ি বেলটা খেয়ে সে মোহর ক্ষেতের দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

হাঁটতে হাঁটতে নয়, একেবারে দৌড়াতে দৌড়াতে সে সেই আশ্চর্য ক্ষেতে গিয়ে হাজির হলো। এদিক সেদিক তাকিয়ে কোথাও কোনো গাছ দেখতে পেলো না সে। খুব চিন্তায় পড়ে গেল। সেই গর্তের মাটি খুঁড়ে মোহর খুঁজতে লাগলো। কোথাও কিছু নেই। সব ফাঁকা। মাথায় হাত দিয়ে মাটির ওপরই বসে পড়লো সে।

হঠাৎ একটা পাখির কিচির মিচির শোনা গেল। হ্যা, সেই তোতা পাখিটা। এই তোতাই তো তার মাথায় পাকা বেল ফেলে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। তোতা পাখিটা হাসতে হাসতে গাছের ডালে লুটোপুটি করতে লাগলো। পিনোকিও-র মনের অবস্থা তোমরা বুঝতেই পারছো। বিরক্ত হয়ে বললো :

–এভাবে হাসবে না বলে দিচ্ছি। কারো সর্বনাশ আর কারো পৌষ মাস।

তোতা পাখির হাসি থেমে গেল। সে পিনোকিও-র মতো করেই সুরে সুরে বলতে লাগলো :

*তুমি একটা আস্ত বোকা*
*ভণ্ডরা তাই দিলো ধোকা।*
*মোহর কি আর গাছে ধরে?*
*ধন পেতে হয় কষ্ট করে।*

তারপর তোতা পাখি সমস্ত ঘটনা কাঠের পুতুলকে খুলে বললো। পুতুল যখন বটতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো সেই সুযোগে ধূর্ত নেকড়ে বাঘ ও ভণ্ড বিড়াল সেই মাটি খুঁড়ে মোহরগুলো নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

হতাশ হয়ে পিনোকিও শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। এটাকে ঠিক শহর বলা যায় না। গাছপালা ঘেরা একটা চমৎকার বন। এখানে কেবল বানরই বাস করে। রাজা থেকে শুরু করে বিচারক, পুলিশ, প্রজা সবাই বানর। পিনোকিও

বানরের কাছে নালিশ করলো। সোনার মোহর চুরি যাওয়ার ঘটনা খুলে বললো। বদমাশ গুণ্ডাদের নাম-ঠিকানাও জানালো এবং সুবিচার প্রার্থনা করলো। নিজের অসহায় অবস্থা বলতে গিয়ে কয়েকবার চোখ মুছলো সে। বিচারক হিসেবে এই বয়স্ক বানরের বেশ নামডাক ছিলো। মনোযোগ দিয়ে পিনোকিও-র সমস্ত ঘটনা শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। বারবার চশমা খুলছিলো আর পরছিলো। হয়তো পিনোকিও-র কষ্টে বিচারক বানরের চোখে পানি এসে থাকবে। যদিও চশমার কোনো কাচ ছিলো না তবু বিচারক বলে কথা। চশমা ছাড়া কি আর চলে? লম্বা দাড়ি দিয়ে চোখ মুছল সে। হাতের কাছে রাখা কয়েকটা কলা টপাটপ খেয়ে ফেললো। খোসা ছুঁড়ে দিলো পিনোকিও-র মুখের ওপর। পিনোকিও কিছু বললো না। ভাবলো : এটাই হয়তো এই বিচারশালার রীতি। হাতের কলমটা দিয়ে কিছু লেখার বদলে তা কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলো কিংবা ঘুমিয়ে নিলো। এজলাসে অন্য বানরগুলো কিচিরমিচির করছিলো। বিজ্ঞ বিচারক হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে কয়েকবার আঘাত করে 'অর্ডার' 'অর্ডার' বলে চিৎকার করে উঠলো। সব আগের মতো চুপচাপ হয়ে গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে বিচারক বানর বললো : এই কে আছিস?

সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া শিয়াল এসে উপস্থিত হলো। তাদের দুজনেরই সৈনিকের পোশাক।

জোড়া শেয়াল সমস্বরে বললো : আদেশ করুন মাননীয় বিচারক।

বিচারক পিনোকিও-র দিকে আঙুল তুলে বললো : এই গর্দভটা চারটি সোনার মোহর চোরের হাতে তুলে দিয়েছে। একে কারাগারে নিক্ষেপ করো।

কাঠের পুতুল এই রায় শুনে তক্তা হয়ে গেল। কিছু বলার আগেই শিয়ালেরা তাকে নাক ধরে টানতে টানতে কারাগারে নিয়ে গেল।

কারাগারে কতো কষ্টেই না দিন যাচ্ছে তার। কখনো কাঁদে, কখনো গালাগাল দিয়ে বিচারক বানরের গুষ্ঠি উদ্ধার করে, কখনো গান গেয়ে সময় কাটে। গান গাইতে গাইতে চোখের জলে জুতো ভিজে যায় :

বন্দি আমি কারাগারে
বাবা তুমি দেখলা নারে।
ওরে আমার পরী-মা
একবার তুই দেখে যা।
ওরে ঝিঁঝিঁ, তোতাপাখি
বন্দি হয়ে তোদের ডাকি।

এইভাবে কারাগারে কাটলো চার মাস। একদিন অন্যরাজ্যের এক যুববানর এই দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিলো। দেশ দখলের আনন্দে কারাগারের দ্বার খুলে দেয়া হলো। পিনোকিও বের হয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় দ্বাররক্ষী হনুমান তাকে বাধা দিলো। বন্দুক উচিয়ে বললো :

–আমরা কেবল চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাস-বেয়াদব–ভণ্ড-বেকুবদেরই মুক্ত করে দিচ্ছি। আপনি ভদ্রলোক। আপনার মুক্তি নেই।

দ্বাররক্ষীর কথা শুনে পিনোকিও অবাক। সে সবিনয়ে বললো :

–আপনি ভুল করছেন। আমারও এমন কিছু গুণ আছে। আমি অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ-ইতর-বেয়াদব-বোকা...

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিনোকিও। কিন্তু দ্বাররক্ষী হনুমান অস্ত্র নামিয়ে কুর্নিশ করে বললো :

–আপনার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ। সুতরাং আপনিও মুক্ত।

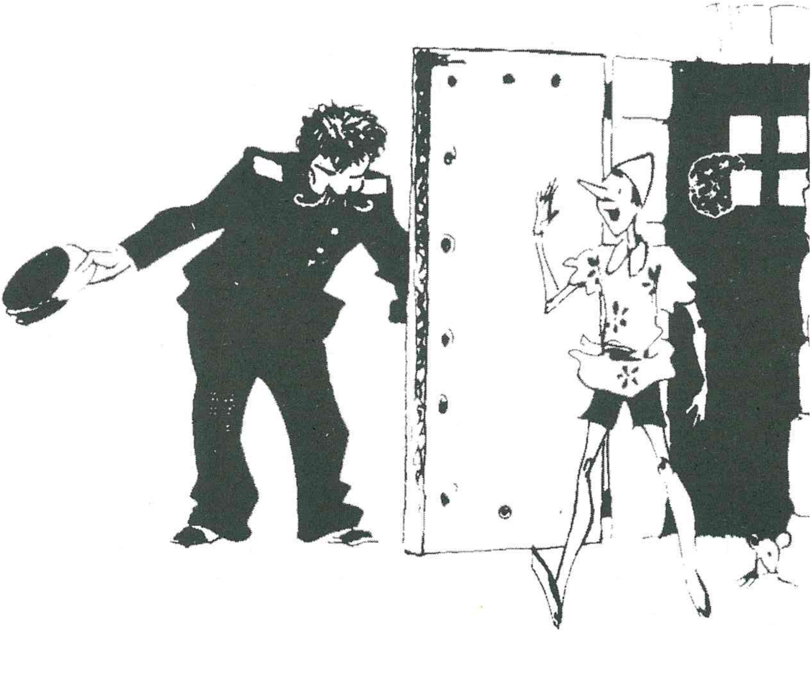

# কুড়ি

*মুক্তি পেয়ে পিনোকিও যাচ্ছে পরীর ঘরে*
*দেখে মস্ত অজগর এক আছে পথের পরে।*
*আঙুর ক্ষেতে করলো সে চুরি করার ফন্দি*
*অবশেষে কপাল দোষে কাঁচিকলেই বন্দি!*

যুববানরের সম্মানে কারাগার থেকে মুক্ত হলো পিনোকিও। নতুন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে গেল। পিনোকিও-র প্রথমেই পরী-মার কথা মনে পড়লো। এক মুহূর্তও দেরি না করে সে বানরের রাজ্য ছেড়ে পরী-মার ঘরের দিকে রওনা হলো।

এদিকে আকাশের অবস্থাও ভালো নয়। পুরো আকাশটাই যেন মেঘের দখলে চলে গেছে। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম কিছুই বোঝার উপায় নেই। কর্দমাক্ত রাস্তা। ছুটতে গিয়ে কয়েকবার পল্টানি খেলো সে। কাদায় সারা শরীর এমন হয়েছে যে, সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না। খুব হাসি পেলো তার। অবশ্য হাসির সময় এটা নয়। পরী-মা বলছিলো বোতল মিয়ার কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। তাই পরীর ঘরে গেলে সে তার বাবাকেও দেখতে পাবে। আর পরী-মার আদর-আপ্যায়নও পাওয়া যাবে। তাই সে ঝড়ের বেগে পরীর ঘরের দিকে ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে নিজের সাথে নিজেই কথা বলছিলো। বড়োদের কথা না শুনেই আজ তার এই অবস্থা। সে বাবার কথা শোনে নি। ঝিঁঝির কথা না শুনে তাকে শাস্তি দিয়েছে। পরী-মার সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করে নি। তোতা পাখির কথায় গুরুত্ব না নিয়ে স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে কারাগারে চারমাস কাটিয়েছে। কারাগারের কথা মনে হতেই বাবার জন্য মনটা কেমন করে উঠলো। পিনোকিও-ই তো মিথ্যা অভিনয় করে বোতল মিয়াকে কারাভোগ করিয়েছে। আরো কতো কথা মনে পড়লো তার। প্রতিজ্ঞা করলো সে :

–আর কখনো কোনো অন্যায় করবো না। একটা বাধ্য. এবং ভালো ছেলের মতো বড়োদের কথা শুনবো।

*আমি হবো সবচে’ ভালো ছেলে*
*বাবা এবং পরী-মাকে পেলে*
*জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলবো*
*মুরুব্বিদের ইচ্ছেমতো চলবো।*
*এতো দিন দুষ্টু ছেলের মতো*
*ভুল করে কষ্ট পেলাম কতো।*
*এতো দিনে শিক্ষা হলো এই :*
*কারো মনে আঘাত দিতে নেই।*

পিনোকিও আরো অনেক কথাই ছন্দে ছন্দে বলে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ তার ছন্দপতন হলো। রাস্তার ওপর শুয়ে আছে বিশাল এক অজগর। ভয়ে পাঁচ পা পিছিয়ে গেল সে। এতো বড়ো অজগর সে জীবনেও দেখে নি। নীল রঙের এই সাপের চোখ থেকে আগুন ঝরছিলো। লেজের দিকে তাকিয়ে পিনোকিও আরো অবাক হলো। একি কাণ্ড! আগুন জ্বলছে চোখে আর ধুঁয়া বের হচ্ছে লেজ দিয়ে! ভয়ে বুকের ভেতরে ধপধপ করতে লাগলো।

আশ্চর্য ব্যাপার। সাপটি নড়াচড়া করছে না কেন? পথ ছেড়ে না দিলে পিনোকিও কিভাবে যাবে? তার তো সময় নষ্ট করার সময় নেই। ভাবলো, এর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধানো ঠিক হবে না। একটু বুঝিয়ে কাজ আদায় করতে পারলে ভালো হয়।

–মাননীয় সর্পরাজ। দয়া করে পথ ছেড়ে দিন। আমার বাড়ি ফিরতে হবে।

কোনো জবাব নেই। আবার অনুরোধ :

–আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? বাড়িতে আমার বাবা এবং পরী-মা অপেক্ষা করছেন। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন এবং একটু পাশ ফিরুন। তাহলেই আমি চলে যেতে পারি।

কোনো কথা নেই। নড়াচড়া নেই। ফুসফাঁস নেই। ঢুসঢাস নেই।

–আমাকে দয়া করুন। পথ ছেড়ে দিন।

কোনো জবাব নেই। আগের মতোই নিথর হয়ে রইলো অজগর।

পিনোকিও-র মনে হলো অজগরটি মরে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত নিলো, সাপের ওপর দিয়েই রাস্তা পার হতে হবে। প্রথম লাফে সে উঠবে সাপের ঘাড়ে। দ্বিতীয় লাফে রাস্তায় নেমে আবার দৌড় দেবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। লাফ দিয়ে সাপের ঘাড়ে উঠতেই অজগর ফোঁস করে গর্জে উঠলো। বিশাল ফণা তোলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বন্ধুরা বুঝতেই পারছো। বেচারা কাঠের পুতুল ভয়ে একেবারে তক্তা হয়ে গেল। লাফ দিয়ে পড়ে গেল রাস্তার পাশের নর্দমায়। নর্দমার নোংরা পচা জলে সাঁতার কাটছে পিনোকিও। গন্ধে বমি আসছিলো তার। মনে হলো এই বিশ্রী গন্ধেই বুঝি মরে যাবে সে।

পিনোকিও-র এই দুর্দশা দেখে সেই বিশাল অজগর হা-হা হো-হো হি-হি করে হাসতে লাগলো। সেই হাসি শুনলে তোমাদের পিলে চমকে যেতো।

অজগরের ছিলো কঠিন অসুখ। হার্টের অসুখ। হাসতে হাসতে তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। বেচারা অজগর হার্ট ফেল করেই মরলো!

পিনোকিও খুশিতে হাত তালি দিতে দিতে রাস্তায় উঠে এলো।

–দেখ্ ব্যাটা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারালি। অন্যের কষ্টে এভাবে হাসলে তো মরতেই হবে।

কাঠের পুতুল আবার দৌড়াতে শুরু করলো। কিন্তু পেটের ভেতর তখন আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এখন কিছু না খেলে যে খিদেয় পেটটাই হজম হয়ে যাবে।

পাশেই একটা আঙুর ক্ষেত চোখে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে আঙুরের ক্ষেতেই ঢুকে পড়লো সে।

এখানেও দেখা দিলো আরেক বিপদ। পিনোকিও আঙুর ক্ষেতে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে খট্ করে একটা শব্দ হলো। আর কাঠের পুতুল 'বাবা গো' 'মা গো' বলে চিৎকার করে উঠলো। দুটো পা-ই আটকে গেল কাঁচি-কলে। তখন সে যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল আঙুর ক্ষেতে।

বন্ধুরা, তোমরা কাঁচি-কল চিনো তো? এই যন্ত্রটায় ধারাল কাস্তের মতো খাঁজ কাটা দুটো অংশ থাকে। এর মাঝখানে পা দিলেই কাঁচি দুটো তার হাঁ করা মুখ বন্ধ করে ফেলে। এই হাঁ-এর মধ্যে পা পড়লে আর রক্ষা নেই। যতোই

টানাটানি করো ততোই তা আরো শক্ত হয়ে পা আকড়ে থাকে।

এই আঙুর বাগানের মালিক শিয়াল ধরার জন্য এই ফাঁদ পেতেছিলো। প্রতি রাতেই শিয়াল এসে এই ক্ষেতের আঙুর খেয়ে যেতো। শুধু কি আঙুর? এই এলাকার হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের বাচ্চা এমন কি কুকুরের বাচ্চা শুদ্ধ সাবাড় করছিলো ধুরন্ধর শিয়ালেরা।

বেচারা পিনোকিও-র কপাল মন্দ। কাঁচি-কলে বন্দি হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। হাত দুটো উপরের দিকে তুলে কাঁদতে শুরু করলো সে। চোখের জলে আঙুর ক্ষেত ভিজে গেল। এই দুঃসময়ে কে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে?

পাশেই একটা ধূর্ত শিয়াল আপন মনে আঙুর খাচ্ছিলো। পিনোকিও-র দুর্দশা দেখে সে 'হুক্কা হুয়া' বলে *নাচতে নাচতে গান ধরলো :*

*আঙুর খেয়ে পড়বো সট্‌কে*
*বোকা পুতুল থাকবে আট্‌কে*
*হুক্কা হুয়া হায় কি মজা*
*শিয়াল পণ্ডিত জ্ঞানের রাজা।*

## একুশ

*সকাল বেলা আঙুর চাষী এলো*
*চোর ধরে সে ঘরে নিয়ে গেলো ।*
*বললো রেগে : শাস্তি দেবো, দাঁড়া*
*কুকুর হয়ে মুরগী দে পাহারা ।*

বেচারা পিনোকিও বিপাকে পড়ে কি কান্নাকাটিই না করলো! কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না । অন্ধকারে ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো । ভয়ে এবং ব্যথায় বোধ করি অজ্ঞানই হয়ে পড়লো সে ।

একটা জোনাক পোকা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো । কাঠের পুতুলের এই অবস্থা দেখে খুব মায়া হলো তার । পিনোকিও-র কাছে এসে জানতে চাইলো :

–এই দশা তোমার কিভাবে হলো ভাই?

–খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম বলে আঙুর খেতে এই ক্ষেতে ঢুকেছিলাম । তার পরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছো ।

–এই কাজটি তুমি ঠিক করো নি । না বলে অন্যের জিনিস তুমি স্পর্শ করতে পারো না ।

–পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা ভাই ।

–এটা তোমার অনধিকার চর্চা। এটা অন্যায় এবং অপরাধ। অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হয়।

এমন সময় জমির মালিক আঙুর ক্ষেতে প্রবেশ করলো । পায়ের শব্দে পুরো আঙুর ক্ষেত যেন থরো থরো করে কাঁপছে। তখন জোনাক পোকা–

*আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো*
*সবার জীবন করবে আলো।*
*আমার গায়ে যে গুণ আছে*
*ছড়িয়ে দেবো সবার কাছে।*

আপন মনে এই গান গাইতে গাইতে পিনোকিও-কে শুভকামনা জানিয়ে দূরে উড়ে গেল।

আঙুর ক্ষেতে শব্দ শুনে মালিকের মনে হলো নিশ্চয়ই কাঁচি-কলে আজ শিয়াল আটকা পড়েছে। কাছে এসে আলো জ্বালিয়ে যা দেখলো তাতে তার চোখ কপালে উঠে গেল। এ যে শিয়াল নয়, কাঠের পুতুল!

মালিকের মনে হলো এই আজব জীবটিই এই পাড়ার সব অপকর্মের জন্য দায়ী। রেগে সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলছিলো তার। পিনোকিও-র দিকে লাঠি উচিয়ে বললো :

–এবার পালাবে কোথায় সোনার চান?

*বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান*
*কাঁচিকলে আট্‌কে দিতে হবে জান্।*
*রাতের আঁধারে তুমি ঘরে দাও হানা*
*খাও হাঁস মুরগি আর ছাগলের ছানা।*

–বিশ্বাস করুন, খিদের যন্ত্রণা সইতে না পেরে দুটো আঙুর খেতে এসেছিলাম। আমি চোর নই। এছাড়া আমি নিরামিষভোজী। কোনো রকমের মাংসের প্রতিই আমার কোনো লোভ নেই। হাঁস মুরগি, গরু-ছাগলের বাচ্চা খেতে ডাক্তার আমাকে বারণ করেছে। পায়ে পড়ি আপনার। আমাকে ছেড়ে দিন। আমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কার কথা কে শোনে! দুই হাত শক্ত করে বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেল পিনোকিও-কে। রাত তখন গভীর। চাষীর খুব ঘুম পাচ্ছিলো। কাঠের পুতুলকে ঘরের

খুটির সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বলে গেল :

–কাল সকালে তোমাকে মজা দেখাবো। আমার মনটা ভীষণ খারাপ। আজ সকালে আমার প্রিয় কুকুরটা আত্মহত্যা করেছে। আমার মুরগি খামারে একজন পাহারাদার চাই। আজ রাতে কুকুরের বদলে তুমিই আমার খামার পাহারা দেবে।

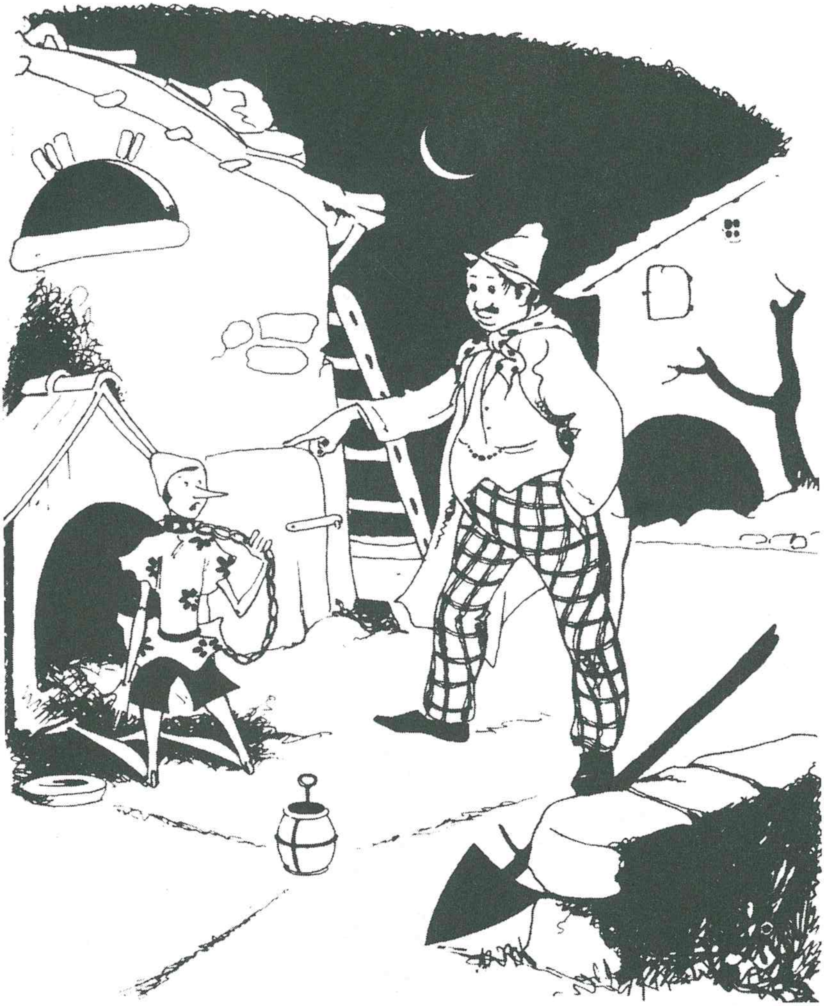

একটা লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাকে। আঙুর চাষী যাওয়ার সময় বলে গেল :

–রাতে বৃষ্টি হলে ঐ ঘরটাতে প্রবেশ করবে। ও-ঘরে এতোদিন আমার প্রিয় কুকুরটা থাকতো। রাতে ঠিকমতো পাহারা দেবে। চোর এলে কুকুরের মতো ডেকে উঠবে যাতে আমি জেগে ওঠে চোর ব্যাটাকে পাকড়াও করতে পারি।

অসহায়ের মতো পিনোকিও মালিকের চলে যাওয়া দেখলো। কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিলো তার। চোখের জল মুছতে মুছতে বললো :

*ওগো আমার পরী-মা*
*একবার এসে দেখে যা*
*কাঁচি-কলে কাটলো আমার পা।*
*কতো করলাম কান্নাকাটি*
*সব অনুরোধ হলো মাটি*
*নিঠুর চাষী মুক্তি দিলো না।*
*মোর কপালে ছিলো এই :*
*কুকুর হয়ে পাহারা দেই*
*ভাগ্যের লেখন, কে খণ্ডাবে তা?*

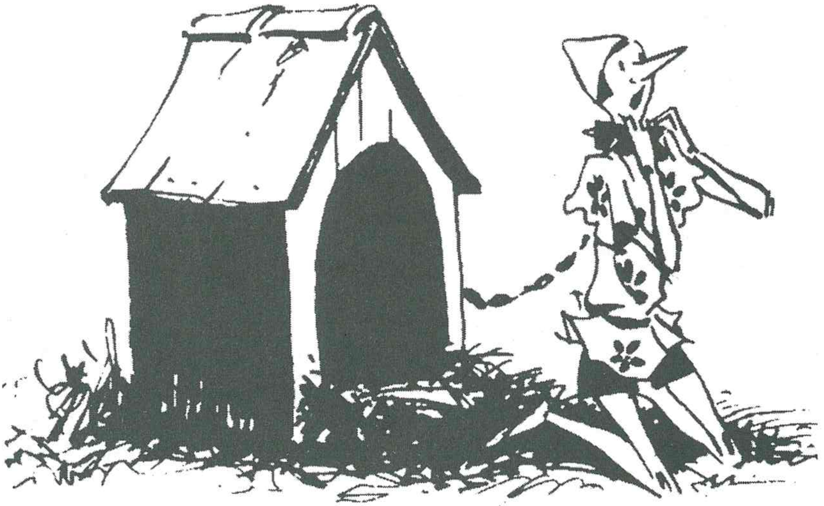

## বাইশ

*পুতুলের বুদ্ধির জোরে*
*মুরগি চোর ধরা পড়ে।*
*মালিক খুব খুশি হলো*
*পিনোকিও মুক্তি পেলো।*

পিনোকিও আঙুর খেতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তার হাতে শিকল পরানো হয়েছে। এটা কষ্টের এবং লজ্জার। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো কুকুরের দায়িত্ব পালন করতে দিয়ে তাকে অপমান করা হয়েছে। এতো বড়ো অপমান সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। কাঠের পুতুল বলে কি তার মানসম্মান নেই? ছি ছি ছি! শেষ পর্যন্ত কুকুরের পরিবর্তে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত হতে হলো! গায়ে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু কি-ই বা করার আছে তার :

*চোর হয়ে যে ধরা পড়ে*
*তাকে দিয়েই চোর ধরে?*

তা না হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কুকুরের ঘরেই তাকে থাকতে হবে? পিনোকিও কিছুতেই এই কষ্ট, লজ্জা, অপমান সহ্য করতে পারছিলো না। যাক গে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন একটু বিশ্রাম করে নেয়া যাক। সারা দিন যা ধকল গেছে!

পিনোকিও চোখ দুটো কেবল বন্ধ করেছে। এমন সময় কিসের যেন ফিসফি-সানি শুনতে পেলো সে। একটু কষ্ট করেই সে চোখ খুললো। দেখলো, একদল শিয়াল গোল হয়ে বসে কি যেন বুদ্ধি-পরামর্শ করছে। পিনোকিও চুপ করে রইলো। দেখা যাক ওরা কি করে। শিয়ালগুলো প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করে তাদের একজন প্রতিনিধি মুরগি ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলো।

পিনোকিও যেখানে শুয়েছিলো সেই দিকে এসে শিয়াল-নেতা ফিসফিস করে ডাকতে শুরু করলো।

–আতু ভাই, শুভ রাত্রি।

–আমি তোমাদের 'আতু ভাই' 'পুতু ভাই' কিংবা 'দুলা ভাই' নই। পুতুল জবাব দিলো।

–তাহলে আপনার পরিচয়?

–আমি নাইট গার্ড। তোমরা 'গার্ড মামা' বলে ডাকতে পারো।

–আমাদের প্রাণপ্রিয় আতু ভাই কোথায়? এখানে তো তার থাকার কথা। সে কি ছুটি নিয়েছে?

–হ্যা তা বলতে পারো। ছুটিই বটে। একেবারে জনমের মতো ছুটি নিয়েছে।

–ব্যাপারটা খুলে বলুন গার্ড মামা।

–আতু ভাই আত্মহত্যা করেছে।

এই কথা শুনে শিয়ালগুলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলো। আহা বেচারা! কতো ভালো ছিলো সে! কান্না থামিয়ে শিয়াল-নেতা আবার কথা বললো :

–তাহলে আতুর জায়গায় নতুন কুকুর হিসেবে আপনি নিয়োগ পেয়েছেন?

–মাফ করবে শিয়াল-নেতা। আমি আতু তুতু কিংবা পুতুর মতো কুকুর নই।

–কিন্তু কুকুর হিসেবেই তো আপনাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপনি আমাদের প্রাণপ্রিয় আতু ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

–সে আমার দুর্ভাগ্য। আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছি।

–যাক সে কথা। এবার কাজের আলোচনায় আসা যাক।

–হ্যা কাজের কথাই বলো। আমি খুব ক্লান্ত। একটু ঘুমাতে চাই।

–দেখুন গার্ড মামা, আমরা আপনার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই। আমাদের মধ্যে একটা দেয়া নেয়ার সম্পর্কে গড়ে তুলতে চাই, যাকে বলে কি-না 'গিভ এন্ড টেক পলিসি'। আমাদের সবাইকেই তো বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সবাইকেই তো কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

–দীর্ঘ ভূমিকা রেখে সরাসরি বলো। কি চাও তোমরা?

–আমাদের এক ডজন মুরগি আর একশ'টা ডিম চাই। অবশ্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি শুধু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকুন। বিনিময়ে এর থেকে একটি মুরগি এবং বারোটা ডিম আপনাকে দেয়া হবে। এতে আপনিও উপকৃত হলেন, আর আমরাও বাঁচলাম। আমাদের আতু ভাইয়ের সঙ্গেও এই চুক্তি ছিলো। তার সঙ্গে আমাদের কখনো কোনো ঝামেলা হয় নাই। বড়ো ভালো ছিলো আতু ভাই। আহা! বেচারা মরে গেল!

–চমৎকার চুক্তি। এজন্যই তো সবাই তোমাদেরকে শিয়াল পণ্ডিত বলে।

*শিয়াল মামা বুদ্ধির রাজা*
*প্রিয় খাবার আণ্ডা-ভাজা।*

প্রশংসা শুনে শিয়ালদের মনে হলো তাদের প্রস্তাবে গার্ড মামা অর্থাৎ পুতুল রাজি হয়েছে। শিয়ালেরা একে একে মুরগির ঘরে চলে গেল। পিনোকিও ভাবলো, এই চোরদের প্রশ্রয় বা পাত্তা দিলে নিজের অপরাধের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। আমি চুরি না করেও চোর হয়ে সাজা ভোগ করছি। কিন্তু এই আসল চোরদের আজ রক্ষা নেই। সব শিয়ালের যখন মুরগির ঘরে যাওয়া শেষ, তখনই পিনোকিও বাইরে থেকে মুরগির ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিলো।

তারপর মালিকের কথা অনুযায়ী কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। পুতুলের চেঁচামেচিতে মালিকের ঘুম ভেঙে গেল।

বন্দুক হাতে মালিক যখন মুরগির ঘরের সামনে দাঁড়ালো তখন পিনোকিও 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করতে লাগলো। মালিক দেখলো মুরগীর ঘরে শিয়ালগুলো ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

এই কাঁপন দেখে পিনোকিও খুব মজা পেলো। হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায়ও সে গান গেয়ে উঠলো :

*শিয়াল মামার পণ্ডিতি আজ পণ্ড*
*মহা জ্ঞানীর ভান করে যে ভণ্ড।*

খামারের মালিক বললো :

–এই রাতের বেলা আর ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না। কাল সকালে

হোটেলে নিয়ে বিক্রি করে দেবো। তাতে চোরদেরও সাজা হলো, আর আমারও দুটো আয় রোজগার হলো। গরম তেলে ভাজলে চুরি করে মুরগি খেয়ে শরীরে যে তেল হয়েছে তা বের হবে।

পিনোকিও পুরো ঘটনা মালিককে খুলে বললো। অবশ্য কুকুরের সঙ্গে শিয়ালের চুক্তির ব্যাপারটা সে চেপে গেল। বেচারা মরে গেছে। ওর শান্তি হোক। মালিক পিনোকিও-র ওপর খুশি হলো। গলা ও হাতের শিকল খুলে দিলো। তারপর জড়িয়ে ধরল বুকে। আদর করতে করতে বললো :

–সত্যিই তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তোমার ওপর আমি খুব অবিচার করেছি। কিছু মনে করো না ভাই। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

পিনোকিও আনন্দে নাচতে শুরু করলো। করতালি দিতে দিতে গান ধরলো:

*চোরের বন্ধু বড়ো চোর*
*তার গলায় ফাঁসি-ডোর।*
*চোরের কথা শুনি নাই*
*মুক্ত হয়ে বাড়ি যাই।*

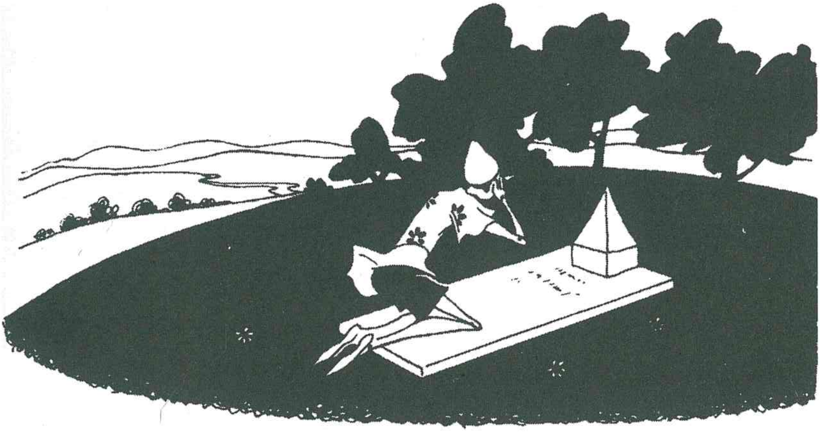

## তেইশ

*পিনোকিও ফিরে এলো পরী-মায়ের কাছে*
*কোথায় পরী, সে কি আর ধরাধামে আছে?*
*কবরের গায়ে দেখে লিখেছে তার মা-ই*
*আমার মৃত্যুর জন্য পুতুল সোনা-ই দায়ী।*
*কপোত এসে জানিয়ে গেল, সমুদ্রে তার বাপ*
*বাবাকে বাঁচাতে পুতুল জলে দিলো ঝাঁপ।*

পিনোকিও ছুটতে ছুটতে পরীর রানীর কাছে এলো। সেখানে সবকিছুই আগের মতো আছে কিন্তু পরী-মার সেই বরফের ঘরটি সে কিছুতেই খুঁজে পেলো না। তাহলে কি সে ভুল জায়গায় এলো নাকি? না তো ভুল হয় নি তার। ঐ তো সেই আম গাছটি দেখা যাচ্ছে যে গাছে গুণ্ডারা তাকে ঝুলিয়েছিলো। এই তো সেই বকুল গাছ যে গাছের গোড়ায় বসে সে আর পরী-মা খেলা করেছিলো, গল্প করেছিলো। তাহলে পরী-মার ঘরটি গেল কোথায়?

এদিক সেদিক খুঁজতে খুঁজতে একটা পাথরের কবর চোখে পড়লো। কবরের গায়ে সোনার হরফে লেখা একটি এপিটাফ। পিনোকিও পড়ার চেষ্টা করলো :

*কোথায় হারিয়ে গেলো বুকের মানিক*
*ভেবেছিলাম একদিন আসবে সে ঠিক*
*কখনো ফিরে এলে বলে দিও ওকে*
*পরী-মা মারা গেছে পুতুলের শোকে*

কবরের ফলক পড়তে পড়তে পিনোকিও নিজেও যেন পাথর হয়ে গেল। কবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। সেই কান্নায় গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়লো। বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কবর বুকে জড়িয়ে ধরলো। আহাজারি করতে করতে বললো:

–এ তুমি কি করলে পরী-মা। তুমি আর কটা দিন অপেক্ষা করতে পারলে না? এখন কে আমাকে আদর করে চুমু দেবে? কে আমাকে মজার মজার খাবার এনে দেবে? কে আমাকে গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেবে? কে আমাকে বাবার খবর এনে দেবে? আমি এখন কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো?

কান্না যেন আর থামতেই চায় না। বারবার কপালে আঘাত করছিলো পিনোকিও। সবই তার কপালের দোষ। নইলে কি আর তার পরী-মা তাকে ছেড়ে পরপারে যায়!

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো পিনোকিও। কবরের ওপর হাত রেখে মাটির ওপরেই শুয়ে পড়লো সে। যেমন করে সে পরী-মার সঙ্গে ঘুমাতো।

এমন সময় একটি শুক পাখি উড়ে এসে কবরের পাশে তমাল গাছে বসলো। পিনোকিও-র দিকে তাকিয়ে বললো :

–এই কাঠের পুতুল তোমার নাম কি?

পিনোকিও চোখ মুছতে মুছতে বললো :

–এখন নাম বলার সময় নয়। আমার পরী-মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি কাঁদছি। এখন বিরক্ত করো না।

–তোমার নাম কি পিনোকিও?

–হ্যা পিনোকিও। বিরক্ত করো না। এখন যাও।

–বোতল মিয়াকে তুমি চেনো?

–বোকার মতো কথা বলো না। তিনি আমার বাবা। বাবাকে চেনে না এমন গর্দভ কোথায় আছে?

–তিনি এখন সমুদ্রে ভাসছেন। একটি ছোট্ট নৌকায় সে সাগর পাড়ি দিয়ে সাগরের ওপারে তোমাকে খুঁজতে বের হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি তোমাকে খুঁজছেন। যদি বাবাকে দেখতে চাও তো সমুদ্রের দিকে যাত্রা করো।

–সমুদ্র কতো দূরে? আমি আমার বাবার কাছে যেতে চাই। কতো দিন বাবাকে দেখি না! বলো শুক পাখি আমি কিভাবে বাবার কাছে যাবো?

–এখান থেকে সমুদ্র কয়েক হাজার মাইল দূর। তবে তুমি চাইলে আমার পিঠে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

পিনোকিও আর দেরি না করে শুক পাখির পিঠে গিয়ে বসলো। শুক পাখি উড়ে চললো সমুদ্রের দিকে।

শুক পাখি উড়ছে তো উড়ছেই। পথ যেন শেষ হতে চায় না। খুব তৃষ্ণা পেলো পিনোকিও-র। শুক পাখি মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে সেখান থেকে পানি ধরে পিনোকিও-র তৃষ্ণা দূর করলো। আরো কয়েক ঘণ্টা ওড়ার পর সেই শুক পাখি সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছালো।

পিনোকিও সমুদ্রের তীরে নেমে ধন্যবাদ দেয়ার আগেই দেখলো শুক পাখি উড়ে চলে গেছে।

সমুদ্রের তীরে অনেক লোকের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিলো। কেউ হায়! হায়! কেউ আহারে! আহারে! আবার কেউ ইশ্‌শিরে! ইশ্‌শিরে! করছিলো আর সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছিলো। পিনোকিও সেই দিকে ছুটে গেল। একজন বয়স্ক লোককে দেখে জিজ্ঞেস করলো :

–এখানে এতো চিৎকার চেঁচামেচি কেন? কি হয়েছে এখানে?

–দেখতে পাচ্ছো না, একটা বুড়ো ছোট্ট এক কাঠের নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে কেমন হাবুডুবু খাচ্ছে। বেচারা বুড়ো তার ছেলের খোঁজে নাকি সমুদ্র পাড়ি দিতে চাচ্ছে।

একজন বুড়ি পিনোকিও-র পাশে দাঁড়িয়েই আহাজারি করতে করতে বললো:

–আহারে! বুড়ো বুঝি এবার ডুবেই গেল। এমন দস্যি ছেলে কারো হয় বাবা! বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিস। একটা চিঠিপত্র তো লিখবি! এই বুড়ো বয়সে ছেলে হারানোর শোকে বুড়ো বোধহয় পাগলই হয়ে গেছে।

সব শুনে পিনোকিও বুঝতে পারলো সবাই তার বাবা বোতল মিয়ার কথাই বলছে। সে সমুদ্রের আরো কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো।

হ্যা, তার বাবা বোতল মিয়াকেই তো দেখছে সে। পিনোকিও 'বাবা' 'বাবা' বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো :

–আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন বাবা? আমি পিনোকিও, আপনার আদরের সোনামণি। ফিরে আসেন বাবা।

নৌকা তখন ডুবুডুবু। একবার ঢেউয়ের ওপর ভেসে উঠছে। আবার ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে ইশারা করলো। টুপি খুলে দোলাতে লাগলো। পিনোকিও-র মনে হলো বাবা বুঝি একবার তার ডাক শুনে তীরের দিকে তাকালো। তারপরই নৌকা আবার জলের আড়াল হয়ে গেল। সবাই নৌকার জেগে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু নৌকা আর জেগে উঠলো না।

পিনোকিও চিৎকার করে বললো:

–আমি আপনাকে মরতে দেবো না বাবা। আমি আপনাকে বাঁচাবোই। আমি আসছি, বাবা।

বলেই সমুদ্র পাড়ের অনেক উচু একটি জায়গা থেকে সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পিনোকিও কাঠের পুতুল। তাই ভাসতে তার মোটেও কষ্ট হলো না। ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক দূরে চলে গেল সে। এক সময় আর তাকে তীর থেকে দেখা গেল না।

তীরে জড়ো হওয়া জনগণ ভাবলো : আজ দুজনেরই সলিল-সমাধি হবে। আফসোস করতে করতে বাপ বেটার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করতে করতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

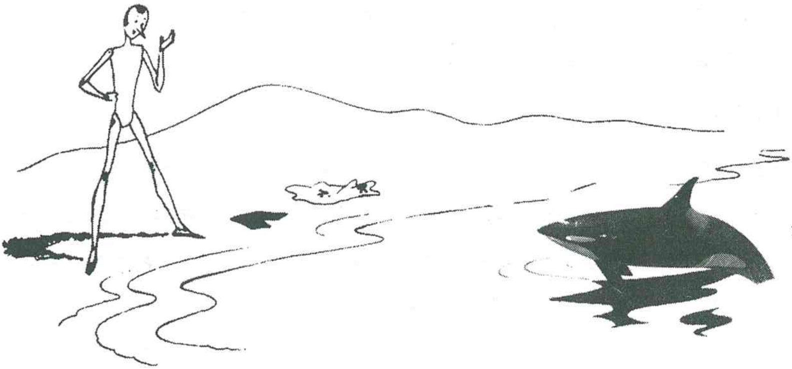

## চব্বিশ

*ভেসে ভেসে সমুদ্রের এক দ্বীপে গেল পিনোকিও*
*পরিশ্রমী মৌমাছিরা বললো : পুতুল সালাম নিও ।*
*কাঠের পুতুল ভাবছে বসে, কপালে কি আছে জানি*
*মৌমাছিদের দ্বীপে-ই সে খুঁজে পেলো পরীর রানী ।*

বোতল মিয়ার খোঁজে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একটা দ্বীপে এসে আশ্রয় নিলো পিনোকিও । সারারাত কি ঝক্কিঝামেলাই না গেছে শরীরের ওপর দিয়ে । সকাল বেলা রোদ উঠলো । পিনোকিও তার গায়ের ভেজা কাপড় রোদে শুকাতে দিলো ।

পিনোকিও ভাবলো, এই দ্বীপের নামটা জানা দরকার । এখানে কোনো মানুষ আছে কি না কে জানে! আবার যদি গুণ্ডারা আক্রমণ করে? অবশ্য এখন আর হারাবার কিছু নাই । গুণ্ডারা বড়ো জোর ঐ ভিজা কাপড়গুলো নিতে পারবে । সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়েই সে এসব কথা ভাবছিলো । হঠাৎ একটা মাছের মতো মনে হলো তার । পিনোকিও ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো । হ্যা মাছই তো! কিন্তু এতোবড়ো মাছ হয় নাকি? এতো হাতির মতো মনে হচ্ছে । আসলে ওটা ছিলো একটা নীল তিমি ।

পিনোকিও ভাবলো, একটু আলাপ করে দেখা যাক :

–ওহে মৎস্যরাজ। শুভ সকাল।

বিশালাকৃতি সেই মাছ লেজ উচিয়ে জানালো : শুভ সকাল।

পিনোকিও অবাক হলো। এ মাছ দেখি লেজ দিয়ে কথা বলে!

পিনোকিও আবার প্রশ্ন করলো :

–দয়া করে বলবেন কি, এই দ্বীপে কোনো জনমানব আছে কি না?

একটু খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। সারারাত সাঁতার কেটে শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা করছে। তার ওপর দুই দিন দুই রাত কিছুই খাওয়া হয় নি। খাবার না পেলে তো আর চলছে না মৎস্য ভাই।

পিনোকিও এবার মাছকে ভাই বলে ডাকলো। মাছের খুব মায়া লাগলো এই কাঠের পুতুলের জন্য। আবার লেজ নেড়েই জানালো :

–মানুষজন নিশ্চয়ই আছে। তোমাকে নাক বরাবর আড়াই ঘন্টা হাঁটতে হবে। সাবধান, নাক যেন ডানে বামে ঘুরাতে যেও না। তাহলেই আবার বিপদে পড়বে।

মাছকে খুব আন্তরিক এবং বন্ধুবৎসল মনে হলো তার। সে ভাবলো : এ মাছ তো এই সমুদ্রেই ঘুরে বেড়ায়। দেখি, বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় কি-না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো :

–আরো একটা প্রশ্ন ছিলো। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

–না, না। মনে করবো কেন? ভাই বলে যখন ডেকেছো, তখন তো আর মনে করার ব্যাপার নেই। বলো, কি জানতে চাও?

–আপনি কি এই সমুদ্রে ছোট্ট নৌকার মধ্যে কোনো বয়স্ক লোককে দেখেছেন?

–তুমি কার কথা বলছো?

–আমি আমার বাবার কথা বলছি। তার নাম বোতল মিয়া। তিনি এক দরিদ্র কাঠমিস্ত্রি। আমার খোঁজে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন।

–ও আচ্ছা। এবার বুঝেছি। সেই রাতের ঝড়ে যে নৌকাটা ডুবে গেছে তুমি তার কথা বলছো।

–বলেন কি ভাই? নৌকা ডুবে গেছে? তাহলে আমার বাবা?

–তিনি এখন হাঙরের পেটের ভেতর। সে এক বিশাল হাঙর। পনেরো বিশটা

ট্রাকও তার পেটের এক কোণায় পড়ে থাকে। ডুবে যাওয়া জাহাজগুলো তো ওই হাঙরের পেটেই যায়।

পিনোকিও সেই তিমি মাছকে বিদায় জানিয়ে জামাকাপড় পরে মাছের নির্দেশমতো নাক বরাবর হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রাম চোখে পড়লো। গ্রামের প্রধান ফটকে একটা নামলিপি ঝুলানো। সেখানে লেখা আছে: শ্রমনগর। এখানে সবাই পরিশ্রম করে জীবনযাপন করে। এই গ্রামের সবাই বিশ্বাস করে : শ্রমের বিনিময়েই সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি-আসে।

গ্রামের নাম দেখেই পিনোকিও-র পিলে চমকে গেল। সে ভাবলো : এই গ্রামে আর এক মুহূর্তও না। আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পেটের ভেতর তো আগুন জ্বলছে। খাবার না হলে আর চলে না।

কাজ না করলে তো খাবার মিলবে না। এখন কি করবে সে?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। ভাবলো, ভিক্ষে করলে কেমন হয়? যদিও বাবা বারবার বলেছেন, কারো কাছে হাত পাততে নেই। সৃষ্টিকর্তা হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য, ভিক্ষা করার জন্য নয়। পিনোকিও-র মনে হলো, বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষা করলে দোষ নেই।

এই কথা যখন ভাবছিলো ঠিক তখনই দেখলো একজন লোক বিশাল এক গাছের গুড়ি ঠেলে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে তার ঘাম ঝরছে। রোদে পুড়ে শরীর কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। পিনোকিও তার সামনে গিয়ে হাত বাড়াল :

*একটা টাকা দিয়া যান*
*আমি গরিব ইনসান।*
*আমি খিদেয় মরে যাই*
*কিছু খাবার কিনতে চাই।*

পরিশ্রমী লোকটা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। কাজ করতে করতে বললো:

–আমার সঙ্গে এই গাছের গুড়ি ঠেলে আমার বাড়ি পৌঁছে দাও। এক টাকা পাবে।

পিনোকিও ক্ষেপে গিয়ে বললো :

–এ আপনি কি বলছেন? আমি ঠেলবো গাছের গুড়ি? অসম্ভব।

–তাহলে না খেয়ে শুটকি মাছ হও।

পিনোকিও পেটে হাত দিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়লো। দুচোখে অন্ধকার দেখছিলো সে। রাস্তায় বসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো :

*আমার আপনজন কেউ নাই*
*দুইটা টাকা ভিক্ষা ভাই।*

এমন সময় দেখলো, একজন কৃষক এক বস্তা মিষ্টি কুমড়া মাথায় নিয়ে হাঁটের দিকে যাচ্ছে। পিনোকিও ভাবলো, লোকটাকে দেখে তো দয়ালুই মনে হচ্ছে। একটু চেষ্টা করে দেখা যাক।

লোকটার সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললো :

*হাঁটুরে ভাই হাঁটে যান*
*একটা টাকা করেন দান।*
*টাকা পেয়ে করবো দোয়া*
*মানুষ হবে পোলা মাইয়া*

সেই দয়ালু লোকটা রাগ করেই বললো :

–তুমি নিজেই তো মানুষ হওনি। এই বয়সেই ভিক্ষে করতে শুরু করেছো। নির্লজ্জ বেহায়া বেশরম কোথাকার। আমার মাথার এই বোঝাটা এক ঘণ্টা নিয়ে দিলে আমি তোমাকে এক টাকা দেবো।

পিনোকিও দেখলো লোকটা তেমন সুবিধের নয়। ভিক্ষে তো দিলোই না, আরো দশ কথা শোনালো। এভাবে প্রায় তিরিশ জন লোকের কাছে হাত পেতে পিনোকিও কিছুই পেলো না।

খিদের মাত্রা বাড়ছে। কিন্তু ভিক্ষে করে কোনো আয় রোজগার হচ্ছে না। মনে হলো এদেশের মানুষগুলো খুব কৃপণ। ভিক্ষে দিতে চায় না। হাঁটছে আর দেখছে কোনো লোক আসছে কি না। কিন্তু পথে তেমন লোকজন নেই। বড়ো ঝামেলা হলো দেখছি! শেষটাতে না খেয়ে মরতে হবে না কি?

পথের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। হঠাৎ একটি সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লো। ভাবলো, মেয়েরা দানখয়রাত বেশি করে। মেয়েদের দয়ামায়া একটু বেশি। এখানে একটু চেষ্টা করা যাক।

মেয়েটি দুই হাতে দুই কলসি পানি নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পিনোকিও মেয়েটির সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললো :

*দয়া করেন মা জননী*
*আমায় একটু খাওয়ান পানি*

সেই সুন্দরী মেয়েটি কলসি নামিয়ে একটা কলসি থেকে আজলা ভরে পিনোকিও-কে পানি খাওয়ালো। পানি খেয়ে গলায় বেশ শক্তি ফিরে এলো। সে আবার সেই মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে সুর করে বলতে লাগলো :

*দুই দিন ধরে পেটটা ফাঁকা*
*দিবেন নাকি দুইটা টাকা?*

কথা শুনে মেয়েটির খুব হাসি পেলো। কিন্তু সে হাসলো না। বললো :

–আমার সঙ্গে কোনো টাকা নেই। তবে এই কলসি দুটির একটি যদি আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারো তাহলে একটা মিষ্টি বিস্কুট খেতে দেবো।

মিষ্টি বিস্কুটের কথা শুনে পিনোকিও-র জিভে জল এলো। কিন্তু তার মুখ শুকিয়ে গেল। এই কলসি কি সে নিতে পারবে? মেয়েটি আবার বললো :

–দেখো নিতে রাজি আছো কি না। বিস্কুটের সঙ্গে না হয় এক মুঠো মুড়ি ও একটু খেজুরের গুড় দেবো।

পিনোকিও-র রাজি না হয়ে উপায় ছিলো না। বাধ্য হয়ে একটা কলসি মেয়েটির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

বাড়ি ফিরে মেয়েটি কেবল মিষ্টি বিস্কুট মুড়ি আর গুড়ই দিলো না, দুটি সন্দেশ, একটি জিলাপি এবং কয়েক রকম মিষ্টি পিঠা খেতে দিলো।

পিনোকিও সব খাবার গোগ্রাসে গিলছিলো যেন।

মেয়েটি অবাক হয়ে এই কাঠের পুতুলের খাওয়া দেখলো।

খাওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় এক কলস পানি সে ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করলো।

খাবার খেয়ে যখন পিনোকিও-র আত্মায় পানি এলো, তখন সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ দেবার জন্য তার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়েই কেমন যেন হয়ে গেল সে। সেই চেনা চোখ, চেনা মুখ, চেনা হাসি, চেনা কণ্ঠস্বর। মেয়েটি বললো :

–এমন করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছো কেনো?

কথা বলতে গিয়ে পিনোকিও-র কণ্ঠ জড়িয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনো রকমে উচ্চারণ করলো:

–তোমাকে তো খুব চেনা লাগছে। তুমি কি আমার সেই পরী-মা?

মেয়েটি কিছু বলার আগেই পিনোকিও তার পরী-মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

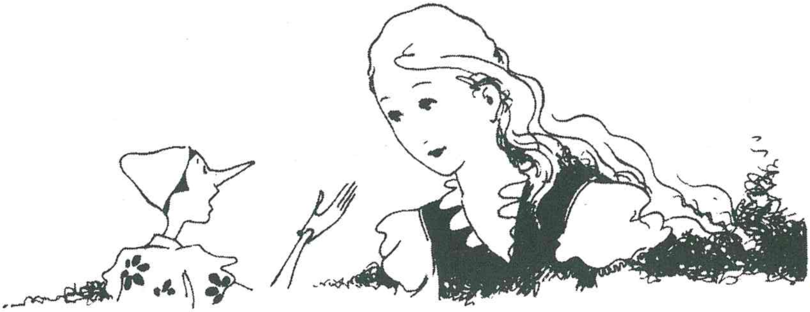

## পঁচিশ

*পিনোকিও শপথ করে : শিখবে লেখা-পড়া*
*ভালো ছেলে হয়ে চাই নিজের জীবন গড়া ।*
*পুতুল হয়ে থাকার মধ্যে সুখের কিছু নাই*
*পরীর রানী বললো : এসব মনে রাখা চাই ।*

পরীর রানী প্রথমে ভাবলেন : এই দুষ্টু পুতুলের কাছে কিছুতেই তিনি তার পরিচয় দেবেন না । কিন্তু পিনোকিও-র কান্নাকাটিতে আর ভান করে থাকতে পারলেন না । পুতুলকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন :

–সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে চিনতে পারলে? ভাবছিলাম কিছুতেই আর ধরা দেবো না । কিন্তু তোমার জন্য মনের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে যায় বাবা । এতো দিন কোথায় ছিলে পুতুল সোনা?

বলেই পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে মুখে হাতে চুমু দিতে লাগলেন ।

পুতুল পরী-মার কোলে বসে আনন্দে চোখের পানি মুছলো । আহা, কতোদিন পর সে তার পরী-মাকে খুঁজে পেয়েছে!

পিনোকিও এতোদিন ঘটে যাওয়া সব ঘটনা পরী-মাকে খুলে বললো । মোহর খোয়া যাওয়ার কথা বললো । বিচার চেয়ে কারাভোগের কথা বললো । আঙুর খেতে গিয়ে কাঁচি-কলে আটকা পড়ার কথা বললো । কুকুর হয়ে মুরগির খামার পাহারা দেওয়ার কথাও বাদ দিলো না । পরী-মা সব কথা শুনে বারবার চোখ মুছলো । তার পুতুল সোনা কতো কষ্ট পেয়েছে!

পরী-মাকে পেয়ে পিনোকিও-র আবদার আবার বেড়ে গেল । গলা জড়িয়ে ধরে বললো :

–এই পুতুলের জীবন আর ভালো লাগে না পরী-মা। কতোদিন ধরে সেই একটুখানিই আছি। আমি কি আর বড়ো হবো না পরী-মা?

–কেমন করে বড়ো হবে পুতুল সোনা? তুমি যে পুতুল। কাঠের পুতুল।

–কিন্তু আমি আর পুতুল থাকতে চাই না। আমি মানুষ হতে চাই।

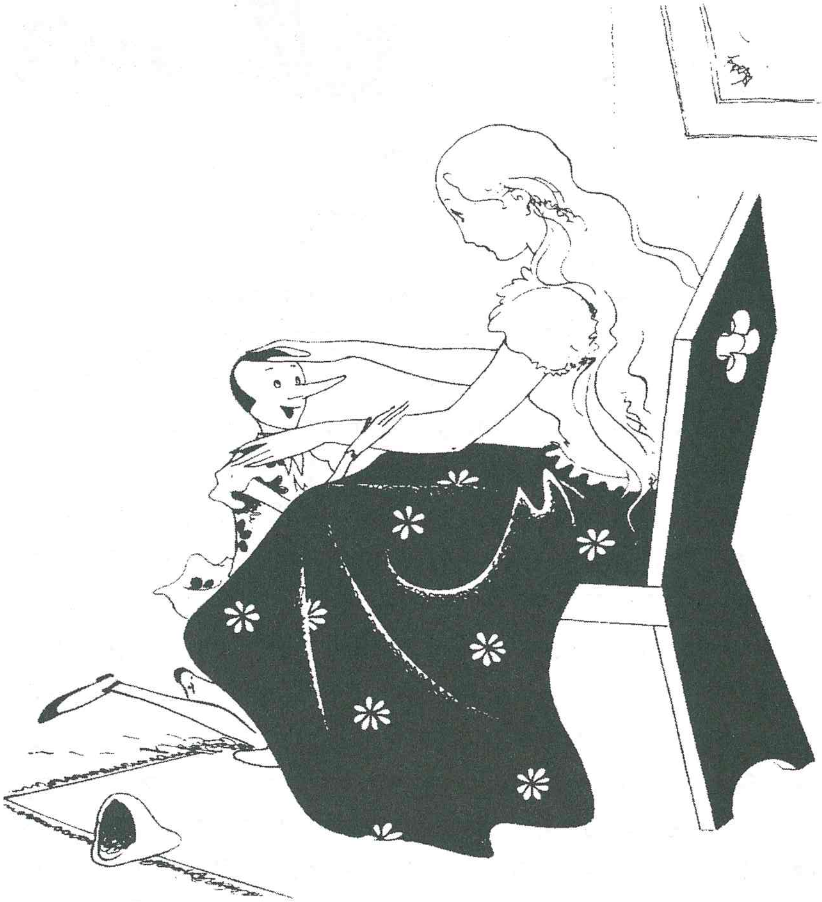

–সে যে অনেক কষ্টের সাধনা বাবা।

–আমি সব পারবো। কি করতে হবে বলো।

–আর দুষ্টুমি করা যাবে না। অবাধ্য হওয়া যাবে না। ভালো ছেলে হয়ে

লেখাপড়ায় মন দিতে হবে। অলস হয়ে যারা খেয়ে আর ঘুমিয়ে দিন কাটায় তারা মানুষ হতে পারে না।

–আমি লেখাপড়া করতে চাই পরী-মা। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে আমি আমার বাবাকে খুশি করতে চাই।

বাবার কথা মনে পড়তেই আবার কান্না জুড়ে দিলো সে। সে কি কান্না। যেন কেঁদে কেঁদে পিনোকিও চোখের পানি দিয়ে পরী-মাকে স্নান করিয়ে দেবে। পরী-মার কাছে জানতে চাইলো :

–তুমি কি জানো পরী-মা, আমার বাবা এখন কোথায়?

–তা তো জানি না।

–কবে বাবার সাথে আবার দেখা হবে!

–নিশ্চয়ই দেখা হবে। তুমি লেখাপড়া শিখে ভালো ছেলে হলেই বাবাকে খুঁজে পাবে।

–সত্যি বলছো তো?

–সত্যি সত্যি সত্যি।

বলেই পুতুলের কপালে চুমু খেয়ে আদর করে নাক টেনে দিলেন।

–তাহলে আজ থেকে তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো, পরী-মা।

–মনে থাকবে তো?

–থাকবে থাকবে থাকবে।

–কাল থেকে তুমি ইস্কুলে যাবে।

–তাই হবে পরী-মা। বলেই মনের আনন্দে একটু নাচলো সে। নেচে নেচে বললো :

*লেখা পড়া করবো*
*নিজের জীবন গড়বো।*
*বলবে যা পরী-মা*
*কেবলই করবো তা।*

হঠাৎ অন্য চিন্তা মাথায় এলো তার। তার তো বয়স বেড়ে গেছে। স্কুলে গেলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি-ঠাট্টা-তামাশা করবে না তো! সাহস করে পরী-মাকে সে বিষয়টা খুলে বললো। পরীর রানী তাকে আবার কোলে বসিয়ে আদর

করতে করতে বললেন :

–শিক্ষার কোনো বয়স নেই বাবা। সব বয়সেই লেখাপড়া করা যায়। শিক্ষা হলো আলো। যার জীবনে শিক্ষা নেই তার জীবন অন্ধকার। লেখাপড়া শিখে, পরিশ্রম করে জীবনকে সুন্দর করতে হবে।

মনটা যেন ভেঙে গেল পিনোকিও-র। লেখা পড়া শিখবে, আবার পরিশ্রম করবে। তাহলে লেখাপড়া শিখে লাভ কি!

পরীর রানী পুতুলের মনে কথা বুঝতে পেরে বললেন :

–তোমার ধারণা ঠিক নয় বাবা। লেখাপড়া শিখেও পরিশ্রম করতে হয়। শিক্ষিত হয়ে কেউ চাকুরি করে, কেউ ব্যবসা করে। সবই পরিশ্রমের কাজ। যে পরিশ্রম করে না তার কোথাও জায়গা নেই। অবশ্য কারাগারে একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কারাগারের কথা শুনে পিনোকিও-র মুখ শুকিয়ে গেল। না, আর সে কারাগারে যেতে চায় না। তার চার মাসের কারাজীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা রয়েছে। লেখাপড়াও বেশ কষ্টের কাজ। কিন্তু এই পুতুলের জীবন আর কতোদিন! সবদিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলো : লেখাপড়াই সে করবে। তাড়াতাড়ি পরী-মার হাত ছুঁয়ে বললো :

*যা বলেছো করবো তাই*
*মানুষ আমি হতে চাই।*

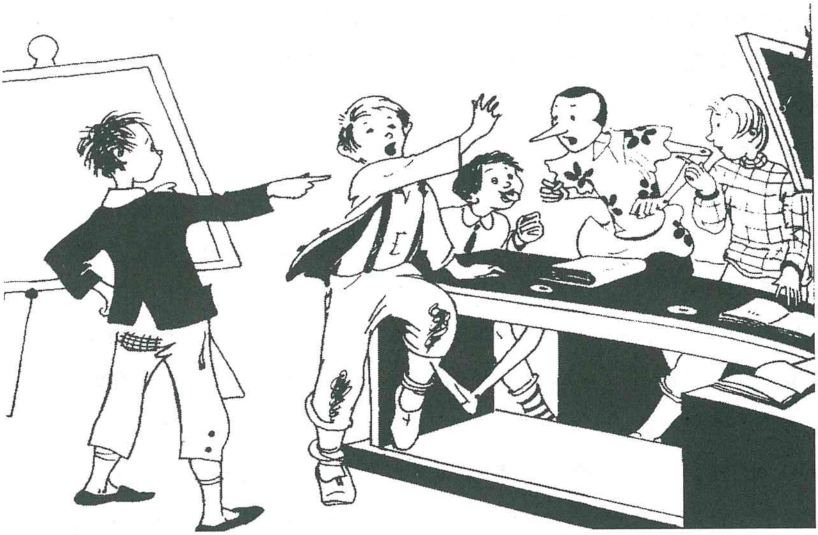

## ছাব্বিশ

*স্কুলে যায় সে মন দিয়ে পড়ে*
*পুতুল দেখে ওরা দুষ্টুমি করে।*
*সমুদ্র তীরে এক বড়ো মাছ এলো*
*সবার সঙ্গে সে সেইখানে গেলো।*

পিনোকিও পরদিন থেকেই স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। স্কুলের অন্য ছেলেরা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলো না। বরং বিরক্তই করলো। টুপি জামা জুতা বই– সব নিয়ে এমন টানাটানি শুরু করে দিলো যে পিনোকিও-র মনে হলো এগুলো বাচ্চা তো নয়, একেবারে বিচ্ছু। এই বিচ্ছু বাহিনীর সঙ্গে সে কিভাবে লেখাপড়া শিখবে!

পিনোকিও প্রথম থেকেই খুব ভদ্রভাবে বসে রইলো। সুন্দর করে শুদ্ধ করে কথা বললো। বিরক্ত না করার জন্য অনুরোধ করলো।

কাঠের পুতুল স্কুলে আসায় ছেলেরা খুব মজা পাচ্ছে। একজন তো পিনোকিও-র মাথার ওপর তবলা বাজাতে বাজাতে গান ধরলো :

*কাঠের পুতুল শক্ত মাথা*
*তার হাতে বই খাতা।*

পিনোকিও বিরক্ত হয়ে ছেলেটির হাত সরিয়ে দিলো। কিছু বললো না। এই সুযোগে আরেকজন পাশ থেকে তার নাক ধরে টানতে শুরু করলো। সে যেন নাক টেনে টেনে বেহালা বাজাচ্ছে, আর গাইছে :

*নাক তোমার দেখতে খাসা*

*নাকের ডগায় পাখির বাসা*

এবারও রাগ করলো না সে। পরী-মা বলে দিয়েছে, কারো সঙ্গে রেগে কথা বলা বা ঝগড়া করা চলবে না। তাই শান্তভাবেই বললো :

–তোমরা আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছো কেনো? আমি তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি। তোমাদের কাছেও ভালো ব্যবহার আশা করছি।

পুতুলের কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠলো। একজন বললো :

–কি মজার কথা! কাঠের পুতুল আমদেরকে আচার-আচরণ শেখাচ্ছে।

বলেই আবার সবাই মিলে হাসতে শুরু করলো এবং পিনোকিও-র কপালে কলম দিয়ে গাধা লিখে দিলো। কতো আর সহ্য করা যায়। রাগে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। যে গাধা লিখছিলো তার নাক বরাবর দিলো এক ঘুসি। চড়কির মতো ঘুরতে ঘুরতে সে পাশের দেয়ালে আছাড় খেয়ে পড়লো। আর যে ছেলেটা নাক ধরে টানাটানি করছিলো তার পেটের ভেতর কনুই দিয়ে দিলো এক গুঁতো। বেচারা তো দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি!

সবাই ভয়ে চুপসে গেল। এতো শক্ত হাত! বাপ রে বাপ! যেন লোহা দিয়ে তৈরি। তখন থেকে সবাই পিনোকিও-কে ভয় পেতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে সবাই তার ব্যবহারে খুশি হলো।

পিনোকিও পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় ক্লাশের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলো। সবাই তার কথা শুনে এবং আদর করে এটা সেটা খেতে দেয়।

সব শিক্ষক তাকে খুব আদর করেন এবং পড়া শিখতে সাহায্য করেন। কখনো পড়ায় ফাঁকি দেয় না সে। সময় মতো স্কুলে আসে এবং পাঠ শেষ করে বাড়ি ফেরে।

স্কুলের ভালো ছেলেরা এবং শিক্ষকরা তাকে পছন্দ করলেও দুষ্টু ছেলেরা মনে মনে ভাবলো : সুযোগ মতো ওরা এই কাঠের পুতুলকে দেখে নেবে।

একটা ছেলে ছিলো খুবই দুষ্টু। সে ছিলো এই দ্বীপের মাতব্বরের ছেলে। মাতব্বরের ছেলে বলেই হয়তো বদমাশের হাড্ডি। ওর নাম ছিলো পল্টু।

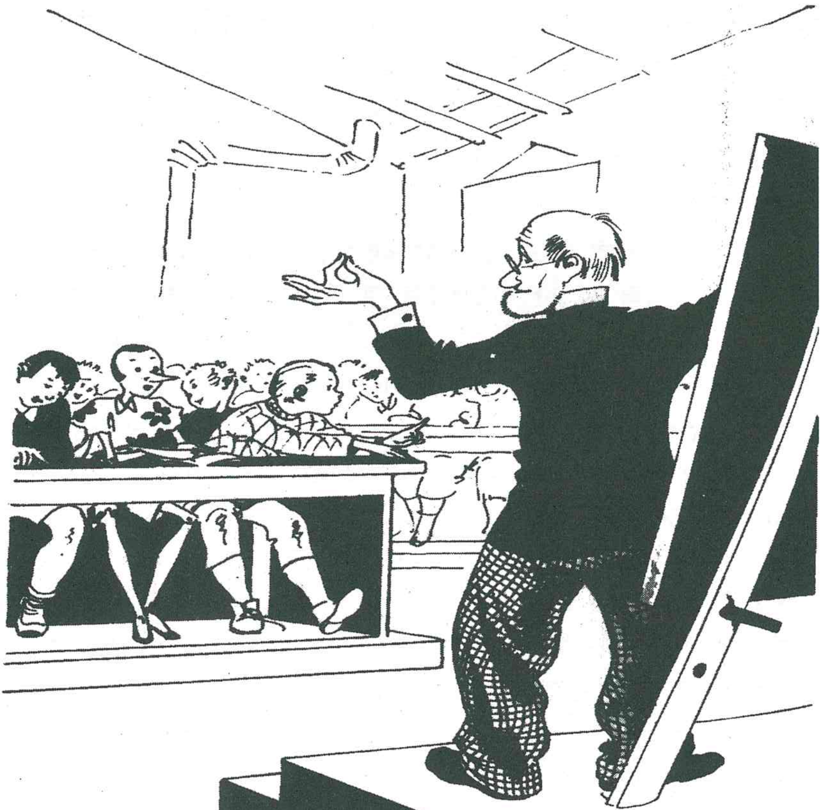

দেখতে খাটো ছিলো বলে অবশ্য বন্ধুরা ওকে বল্টু বলেই ডাকতো। শিক্ষকরা পিনোকিও-কে প্রায়ই বলতেন :

–ওই পল্টুর সঙ্গে মেলামেশা করো না।

–কেনো স্যার? পল্টুও তো আমাদের বন্ধু হতে পারে।

–দুষ্টু বন্ধু বড়ো ভয়ঙ্কর। ও তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। কথায় বলে : সৎ সঙ্গে স্বর্গেবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

পিনোকিও ভাবতো। স্যার ঠিকই বলেছেন। তার পরী-মাও তাই বলেছেন।

দুষ্টু পল্টু কিন্তু পিনোকিও-র পিছু লেগেই থাকলো। সুযোগ পেলেই কাঠের পুতুলকে সাইজ করবে সে।

একদিন ঘটলো এক ঘটনা। স্কুলে যাওয়ার পথে পিনোকিও দেখলো পল্টুর সঙ্গে তার স্কুলের আরো একদল ছেলে রাস্তায় জটলা করছে। পিনোকিও সেই দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে সবাই ছুটে এলো। তারপর বললো :

–কিছু শুনেছো নাকি পিনোকিও?

–কি শুনবো?

–বা রে, তুমি কিছুই জানো না? সাগরের পাড়ে নাকি এক মস্ত- বড়ো মাছ এসেছে। মাছ তো নয় যেন পাহাড়। আমরা সেখানে যাচ্ছি। যদি দেখতে চাও তো চলো ।

–না আমার হাতে সময় নেই। আমি এখন স্কুলে যাবো।

–আহা, স্কুলে তো আমরাও যাবো। এক দৌড়ে মাছটা দেখে আসি। ওদের কথায় পটে গেল পিনোকিও। অবশ্য আরো একটা ব্যাপার আছে। বড়ো মাছের কথা শুনে মনে হলো, এই মাছের কথাই সেই নীল তিমিটা বলেছিলো। এই মাছের কাছেই হয়তো বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে।

সবাই মিলে সাগরের দিকে দিলো এক দৌড়। পিনোকিও-র সঙ্গে দৌড়ে কি কেউ পারে? সে পিছন ফিরে দেখলো, তার বন্ধুরা অনেক পেছনে পড়ে গেছে। জয়ের আনন্দে আরো জোরে দৌড় দিলো সে।

পিনোকিও বুঝতেই পারলো না, দুষ্টু পল্টু ও তার বন্ধুদের বুদ্ধিতে কি ভয়নাক বিপদের পথেই সে পা বাড়িয়েছে!

## সাতাশ

*সাগরে মাছ নেই হলো সে ক্রুদ্ধ*
*এভাবে শুরু হলো হাতাহাতি, যুদ্ধ।*
*একজন আহত হয়ে গেলো তাতে*
*পিনোকিও পড়ল পুলিশের হাতে।*
*টুপির অজুহাতে সে গেলো কিছু দূর*
*পুলিশ লেলিয়ে দিলো শিকারী কুকুর!*

পিনোকিও সাগরের তীরে এসে মাছ খুঁজতে শুরু করেছে। কিন্তু এখানে মাছের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে সে সাগরের তীরের বালুর ওপরই বসে পড়লো।

তার মিনিট বিশেক পর অন্য বন্ধুরা তীরে এসে পৌঁছাল। পিনোকিও জিজ্ঞেস করলো :

–মাছ কোথায়?

–তোমার মাথায়।

বলেই বন্ধুরা হা হা করে হাসতে হাসতে বালির ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলো। পিনোকিও বুঝল তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলো :

–আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেনো?

এবার পল্টু কথা বললো। খুব খুশি খুশি লাগলো ওকে। মনে হয় যেন তার

অনেক দিনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। বললো :

–তোমাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার সোনার চান।

–শিক্ষা তো স্যাররা দেন। শিক্ষার জন্যই তো স্কুলে যাই। এখানে কেনো? চলো স্কুলে ফিরে যাই।

–না। এসব লেখা পড়া চলবে না। তুমি নিয়মিত লেখাপড়া করে আমাদের সবাইকে অপমান করছো। তোমার কারণে আমরা সবাই ক্লাশে মার খাচ্ছি। তোমাকে আমাদের দলে আসতে হবে। নতুবা ঐ সাগরের জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো।

খুব হাসি পেলো পিনোকিও-র। গায়ে নেই এক রত্তি বল। কিন্তু বাহাদুরি দেখাচ্ছে। কথায় বলে, ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম।

এই হাসি দেখে ওরা আরো রেগে গেল। পল্টু বললো :

–এভাবে হেসে কোনো লাভ হবে না। তুমি একা আর আমরা দশ জন। জানোই তো, দশের লাঠি একের বোঝা। গুঁতা খেয়ে একেবারে সোজা হয়ে যাবে।

এই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। পিনোকিও দশজনের সঙ্গে লড়ছে। একা। ওরা সবাই যার যার বই ছুঁড়ে মারতে লাগলো পিনোকিও-র গায়ে। স্কুলের ছাত্রদের এই দুর্দশা দেখে বাংলা, ইংরেজি, সমাজ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম যেন সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার মাছ সাগরের তীরে এসে জড়ো হলো। মাছেরা সবাই 'সাবাস কাঠের পুতুল' 'সাবাস কাঠের পুতুল' বলে তাকে বাহবা দিতে লাগলো।

মারামারির এক পর্যায়ে তারা পিনোকিও-র বইগুলো কেড়ে নিলো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো সাগরের পানিতে। কিন্তু একটা বই ছিলো খুব মোটা। ইতিহাসের বই। ওজন পনেরো কেজির কম হবে না। সেই বইটি পানি পর্যন্ত পৌঁছাল না। একটি ছেলে দৌড়ে গিয়ে সেই বইটি এনে পিনোকিও-র মাথার ওপর আঘাত করলো, কিন্তু মাথা সরিয়ে নেওয়ায় সেই আঘাত গিয়ে লাগলো তাদের দলেরই এক দুষ্টু ছেলে ট্যাপার মাথায়। 'বাবা গো' 'মা গো' বলে ট্যাপা মাটিতে গড়িয়ে

পড়লো। অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

ট্যাপার এই অবস্থা দেখে দুষ্টু ছেলেরা সবাই এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওরা ভাবলো ট্যাপা মরে গেছে। বেচারা পিনোকিও পড়লো মহা ফ্যাসাদে। কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে সাগরের পাড়ে গিয়ে জুতো ভিজিয়ে পানি এনে ট্যাপার মাথায় দিলো। মুখের ভেতরও একটু দিলো। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে 'ট্যাপা' 'ট্যাপা' বলে ডাকতে লাগলো সে। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

পিনোকিও-র মুখ শুকিয়ে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল। ট্যাপার মাথাটা তার কোলের ওপর রাখলো। এই বোকামির জন্য নিজেকে গর্দভ বলে গাল দিলো। স্কুলে না গিয়ে দুষ্টু বন্ধুদের কুপরামর্শে কি ভুলই না সে করেছে! এখন আমার কি হবে!

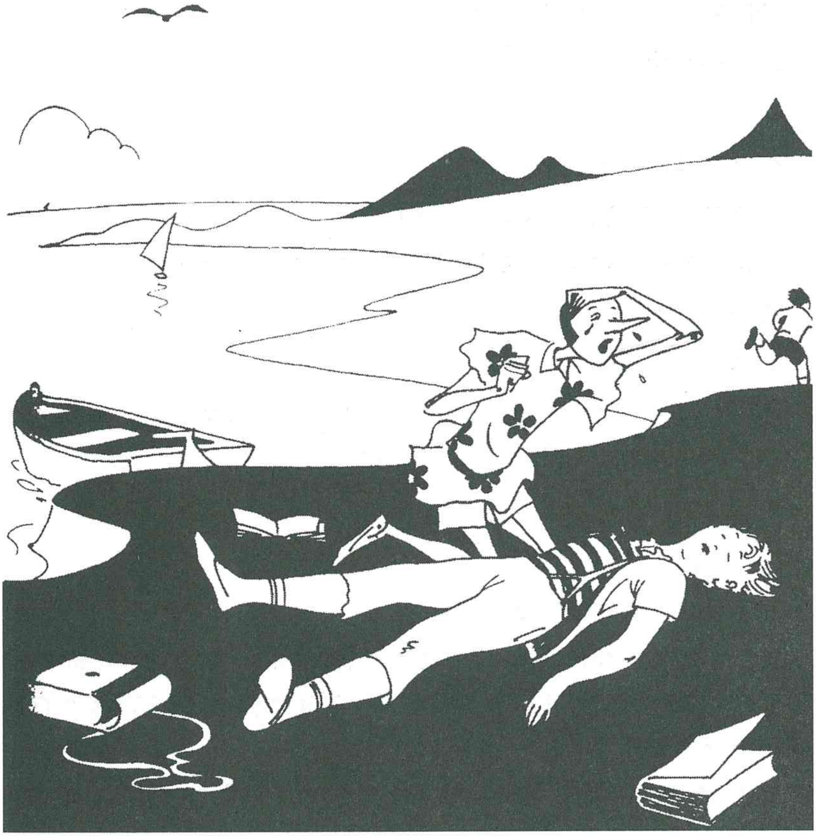

ট্যাপা যদি সত্যি সত্যিই মারা যায়!

এইসব ভাবতে ভাবতে সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, সামনে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

–এখানে বালুর ওপর বসে আছো কেনো?

–আমার বন্ধুর সেবা করছি।

–কি হয়েছে ওর? শরীর খারাপ?

–তাই হবে?

একজন পুলিশ নিচু হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। চিৎকার করে বলে :

–একি, মাথায় তো আঘাতের চিহ্ন।

–তুমি ওকে আঘাত করেছো?

–না।

–কি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে?

–বই দিয়ে। ইতিহাসের মোটা শক্ত বই দিয়ে।

একজন পুলিশ একটু কষ্ট করেই বইটা উচু করলো। তারপর বললো :

–এটা কার বই?

–আমার।

পুলিশ যেন সব কিছু বুঝে গেল। যেন সব কিছু প্রমাণ হয়ে গেছে। লাঠি দিয়ে পিনোকিও-র পেছনে দুটো আঘাত করে বললো :

–থানায় চলো।

–আমি নির্দোষ।

–সেটা আদালতে প্রমাণ হবে।

আর কোনো কথা বলার সুযোগই পেলো না পিনোকিও। মানুষ যেমন ছাগলকে রশি ধরে টেনে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে কাঠের পুতুলের কোমরে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে চললো।

বেচারা ট্যাপাকে নিয়ে হলো আরেক ঝামেলা। এই অবস্থায় তো আর

ছেলেটাকে ফেলে যেতে পারে না তারা। পুলিশ হলেও তারা তো মানুষ। পাশ দিয়েই একজন বাদাম চাষী যাচ্ছিলো। সাগর তীরের বালুতে সে বাদাম চাষ করে। বাদাম ক্ষেত থেকে ফেরার পথে দেখলো, একটা কাঠের পুতুলের কোমড়ে রশি বাঁধা হচ্ছে। পুলিশের কাছে জিজ্ঞেস করলো :

–কি হয়েছে পুলিশ ভাই?

–ইতিহাসের মোটা বই দিয়ে এই ছেলেটার মাথায় আঘাত করা হয়েছে।

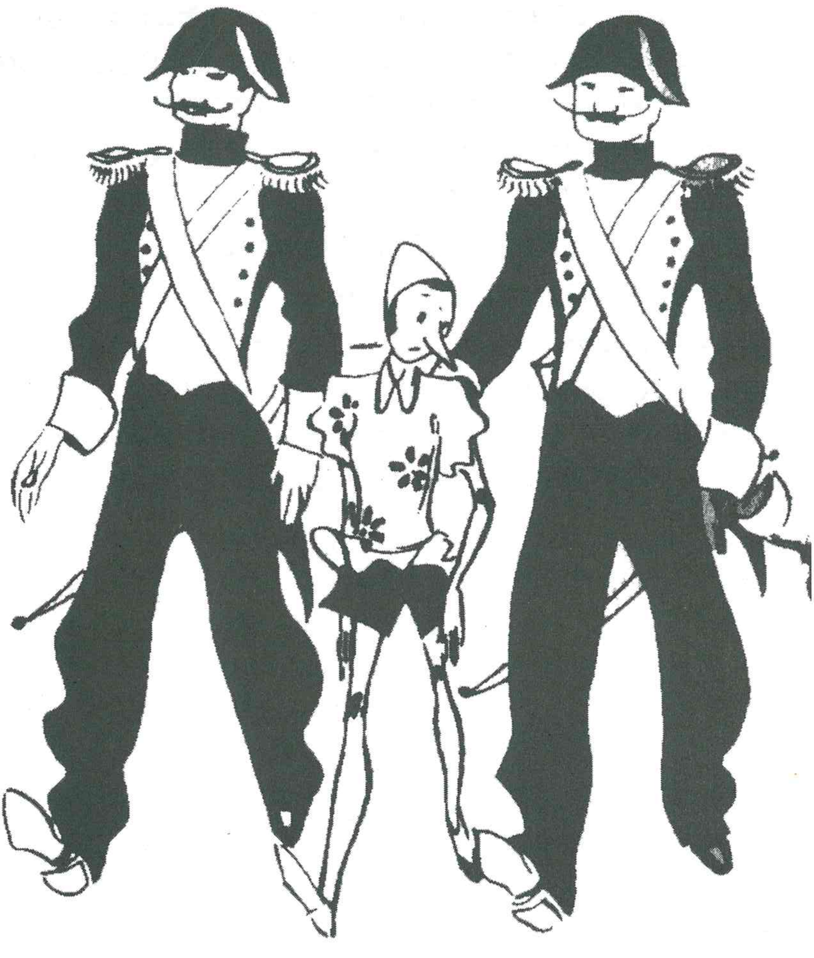

–আহা বেচারা।

–তুমি একটু উপকার করো চাষী ভাই। এই অসুস্থ ছেলেটাকে তুমি বাড়ি নিয়ে সেবা যত্ন করো। আমরা এই বদমাশ পুতুলের হাড্ডি ভেঙে গুড়া গুড়া করে কারাগারে বন্দী করে রাখি।

–তা না হয় নিয়ে গেলাম, কিন্তু বেচারার বাবা মাকে তো জানানো দরকার।

–সে আমরা জানিয়ে দেবো।

হতভাগ্য নিরপরাধ পুতুলকে গ্রামের ভেতর দিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লজ্জায় তার মুখটা ছোট হয়ে গেল। এই অবস্থায় যদি পরী-মা দেখে তাহলে কি হবে? ভাবছে আর হাঁটছে। আগে এক পুলিশ হাত ধরে টানছে। পেছনে আরেক পুলিশ মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে কোমড়ে আঘাত করছে।

হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে পিনোকিও-র টুপি উড়িয়ে নিয়ে বিশ হাত দূরে জঙ্গলে নিয়ে ফেললো। পিনোকিও ভদ্রভাবে বললো :

–পুলিশ ভাই, অনুমতি দিলে আমার টুপিটা নিয়ে আসতাম।

–আচ্ছা যাও। এক দৌড়ে যাবে আর আসবে।

পিনোকিও টুপির কাছে গিয়ে টুপিটা মুখে নিয়ে দিলো এক দৌড়। পুলিশ দেখলো এর সঙ্গে দৌড়ে পারবে না। সঙ্গেই তাদের শিকারি কুকুরটা ছিলো। দৌড়বিদ হিসেবে সেই কুকুরের ছিলো খুব নামডাক। ওরা পিনোকিও-র পিছনে সেই কুকুর লেলিয়ে দিলো। পিছনে কুকুর ছুটছে দেখে সে দৌড়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো।

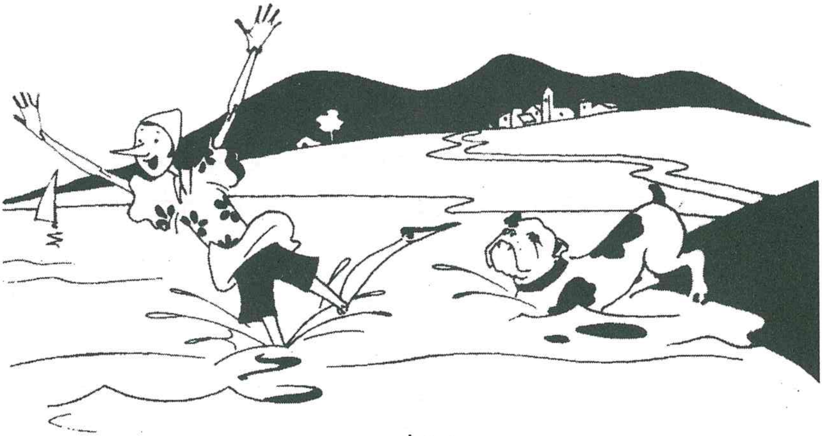

## আঠাশ

*সাগর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে*
*বন্দি হলো জেলের হাতে।*
*হায় অভাগা কাঠের পুতুল*
*সিদ্ধ হবে মাছের সাথে!*

এই কুকুরের নাম বাঘা। সে এই দ্বীপের দ্রুততম কুকুর হিসেবে পরপর তিনবার পুরস্কার পেয়েছে। বাঘা ছুটছে পিনেকিও-র পিছনে। সেও লম্বা লম্বা পা ফেলে সাগরের পাড় ঘেঁসে দৌড়াচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে বাঘা পিনোকিও-র খুব কাছে এসে পড়েছে। ধরা পড়ে যায় আর কি! এমন সময় বুদ্ধি করে সেই সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। বাঘাও দৌড়ে এসে পানিতে ঝাঁপ দিলো। কুকুরের মনে ছিলো না যে সে সাঁতার জানে না। পানিতে ডুবে যখন মরে মরে অবস্থা তখন সে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে লাগলো। পিনোকিও খুব মজা পাচ্ছিলো। সে ভাসতে ভাসতে হাত তালি দিয়ে বলছিলো:

*আমার সাথে লাগতে এলে*
*পেট ভরে তাই পানি খেলে।*
*ডুবে মরলেও তুলবো না*
*ধাওয়া করেছো ভুলবো না।*

বাঘা কুকুর ঢকঢক করে পানি খাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপির পর কাঁদতে কাঁদতে

বললো :

—আমার জান বাঁচাও ভাই। সুযোগ পেলে আমিও তোমার উপকার করবো। এই কান ধরে বলছি, জীবনেও আর তোমাকে পেছন থেকে ধাওয়া করবো না। আজকের মতো আমাকে রক্ষা করো।

পিনোকিও-র মায়া হলো। কুকুরটাকে লেজ ধরে টেনে তুললো। তীরে ওঠে বাঘা কাঠের পুতুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো।

কুকুর স্পর্শ করায় পিনোকিও-র নিজেকে খুব নোংরা মনে হলো। ভাবলো : সাগরে নেমে স্নান করে পবিত্র হয়ে আসি।

সাগরে নেমে ডুব দিয়ে মাথা তুলেই দেখলো, আকাশ থেকে কি যেন হাঁ করে সাগরের মধ্যে পড়লো। তারপর সে সেই হাঁ-এ আটকে গেল।

পিনোকিও আরো অনেক মাছের সঙ্গে একজন জেলের জালে বন্দি হয়েছে। সে আফসোস করছে আর ভাবছে : এতো দেখছি পানিতেও শান্তি নেই। সব জায়গায়ই শত্রু।

কি অদ্ভুত চেহারা রে বাবা! একি মানুষ, না দানব? এমন বিশ্রী মানুষ সে জীবনেও দেখে নি। সেই বিশ্রী লোকটা জাল ওপরে তুলে কি কি মাছ পেলো ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলো। খুব খুশি হলো সে। এক সাথে অনেক মাছ পেয়েছে। নানা রকমের মাছ নাড়তে নাড়তে জেলের হাতে উঠে এলো একটা আশ্চর্য জীব। জেলে তো অবাক। এ আবার কেমন মাছ? এমন মাছ তো সে তার ষাট বছরের জেলে-জীবনে কখনো দেখে নি। কি নাম এই মাছের? নাম যাই হোক, খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না। বলেই অন্য সব মাছের সঙ্গে পিনোকিও-কেও একটা মস্ত বড়ো হাঁড়ির মধ্যে রাখলো।

পিনোকিও চিৎকার করে উঠলো।

–দয়া করে আমাকে এই ছোটো জাতের মাছের সঙ্গে রাখবেন না। আমি মাছ নই। আমাকে মুক্ত করে দিন।

জেলে তো আরো অবাক। মাছও দেখছি আজকাল কথা বলতে শিখেছে।

–সে তো হয় না বাপু। তোমাকে ধরেছি তো মুক্ত করার জন্য নয়। ভেজে খাওয়ার জন্য। অবশ্য সিদ্ধ করে বা পুড়েও খাওয়া যায়। তুমি কিভাবে মরতে চাও? মরার আগে তোমার শেষ ইচ্ছাটাকে আমি অবশ্যই গুরুত্ব দেবো।

সব মাছ নিয়ে সেই জেলে তার নিজের ডেড়ায় ফিরে গেল। পাশেই একটা কড়াইতে ফুটন্ত তেল টগবগ করছিলো। সে দৃশ্য দেখে পিনোকিও-র অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ভদ্রভাবে সেই বিশ্রী লোকটাকে বোঝাতে চাইলো সে :

–আপনাকে বারবার বলছি আমি মাছ নই। আমাকে মুক্তি দিন। আমার অনেক কাজ। পরী-মার কাছে যেতে হবে। বাবাকে খুঁজে বের করতে হবে।

–মিঠে কথায় চিড়ে ভিজবে না বাপু। তুমি মাছ হও আর যাই হও, তুমি আজ আমার পেটে যাবে। মরার আগে একটু চুপচাপ বসো তো।

আমার কাজের সময় বিরক্ত করো না।

বিশাল একটা বটি নিয়ে জেলে মাছ কাটতে বসলো। বটির পাশে এক বস্তা ছাই ঢেলে নিলো। ছাই না হলে এই পিচ্ছিল মাছগুলো সে কাটবে কি করে?

একটা করে মাছ কাটছে আর পাশের বালতিতে রাখা পানিতে ধুয়ে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে পিনোকিও-র কি অবস্থা হতে পারে তোমরা তা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছো। বেচারার হাত পা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। শরীরের সব রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে। পরী-মার কথা মনে পড়ছে।

–আমাকে না পেয়ে পরী-মা যদি আবার মরে যায়? আহারে, মরার আগে বাবার মুখটা বুঝি আর দেখা হলো না। আমাকে তুমি মাফ করে দিও পরী-মা। তোমার কথা না শুনে আমি আজ ফুটন্ত তেলের কড়াইতে মৃত্যুবরণ করছি।

পিনোকিও যখন এইসব ভাবছিলো, তখন জেলে তাকে হাতে তুলে নিলো।

–সত্যি, এ এক আজব মাছ। এ মাছ তো আমার মতোই কথা বলে। এতো দেখছি বুদ্ধিমান মাছ। এটা খেলে আমার বুদ্ধি আরো বেড়ে যাবে।

পিনোকিও-র শত কান্নাকাটিতেও কোনো লাভ হলো না। পুতুলের লম্বা পা ধরে ছাইয়ের মধ্যে কয়েকবার গড়িয়ে নিলো। গায়ে তেমন আঁশ নেই এই আজব মাছের।

পিনাকিও-কে বালতির পানিতে নাকানি চুবানি দিয়ে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ছুঁড়ে দেবে, এমন সময় দরোজায় কার যেন করাঘাত শুনতে পেলো।

## ঊনত্রিশ

*পিনোকিও ফিরে আসে পরীর ঘরে*
*পুতুল আর রবে না সে শপথ করে।*
*ভালো ছেলে হওয়া খুব প্রয়োজন*
*হলো তাই উৎসবের আয়োজন।*

রাগে জেলের মুখটা আরো বিশ্রী হয়ে গেল। খাওয়ার সময় সে কারো উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো :

–এই অসময়ে আবার কে? আমি ব্যস্ত দরোজা খুলতে পারবো না।

বাইরে থেকে শব্দ হলো :

–তাড়াতাড়ি খুলো ভাই। আমার মহা বিপদ।

বিপদের কথা শুনে দরোজা না খুলে পারলো না। সেই অদ্ভুত মাছটি হাতে নিয়েই দরোজা খুলতে গেল সে। দরোজা খুলেই দেখে এই দ্বীপের দ্রুততম

কুকুর ‘বাঘা’ দাঁড়িয়ে আছে।

–আমি ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি। আমাকে কিছু মাছ দাও।

–সে হয় না বাঘা। তোমার কষ্ট করে মাছ ধরে খাওয়া উচিত।

পিনোকিও চোখ বন্ধ করে জেলের হাতে পড়েছিলো। বাঘার কণ্ঠস্বর শুনেই তার খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো। নাম শোনার পর নিশ্চিত হলো। তারপর হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলো সে :

–আমাকে বাঁচাও বাঘা ভাই। এই জেলে আমাকে ভাজা ভাজা করে খেয়ে ফেলবে।

বাঘার মনে পড়লো এই পুতুলই তাকে পানি থেকে টেনে তুলেছিলো। যে তার জীবন বাঁচিয়েছে তাকে তো এভাবে মরতে দেয়া যায় না। সে তার ক্ষুধার কথা ভুলে গেল। আচমকা জেলের হাত থেকে পিনোকিও-কে ছিনিয়ে নিলো। পুতুলের ঘাড় শক্ত করে কামড়ে ধরে দিলো এক দৌড়।

সেই বিশ্রী ভয়ঙ্কর জেলে বাঘার পিছন পিছন ছুটে চললো। কিন্তু বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারলো না। হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠলো। বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লো রাস্তার মধ্যে।

বাঘা পিনোকিও-কে কামড়ে ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা গ্রামের ভেতর চলে এলো। বিপদ কেটে গেছে দেখে পুতুলকে মুখ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলো।

পিনোকিও বাঘাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বন্ধুরা, তোমাদের মনে আছে তো? এই কুকুরকে স্পর্শ করেছিলো বলে কাঠের পুতুল নদীতে গোসল করে পবিত্র হতে গিয়ে জেলের জালে ধরা পড়েছিলো। বাঘার মুখে ও কপালে চুমু খেয়ে পিনোকিও বললো :

–তুমি আমাকে বাঁচালে ভাই। তোমার এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

–একথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না বন্ধু। তুমিও তো একদিন আমাকে সাগরের পানি থেকে উদ্ধার করেছিলে।

–আমাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই। আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম :

*ওরে আমার বাঘা বন্ধু*
*বুকের কাছে আয়,*
*তোর কারণে পিনোকিও*
*প্রাণে বেঁচে যায়।*

তারপর দুজনে কোলাকুলি করে যে যার পথে রওয়ানা হলো। পিনোকিও একা একা মন খারাপ করে হাঁটছে। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়লো ট্যাপার কথা। বেচারা মরে গেল না তো? খুব কষ্ট লাগলো তার। যদিও সে ট্যাপাকে আঘাত করে নি তবু সে নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলো। বই দিয়ে আঘাত করার সময় তার মাথাটা সরানো উচিত হয় নি। তার মাথায় লাগলে তো কিছুই হতো না। যে শক্ত তার মাথা। হয়তো বইটাই ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যেতো।

হাঁটতে হাঁটতে সেই বাদাম চাষীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। পিনোকিও তার কাছে ট্যাপার কথা জানতে চাইলো :

–চাচা মিয়া ভালো আছেন?

–ও তুমি সেই দস্যি ছেলে? জেল থেকে মুক্তি পেলে কবে?

–আমার কথা থাক। ট্যাপার খবর বলুন। ট্যাপা কি মরে গেছে?

–কি সব অলক্ষুণে কথা বলো! ট্যাপা মরতে যাবে কেনো? ও সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে।

খুশিতে মনটা নেচে উঠলো পিনোকিও-র। তারপর সে সেই দিনের সব ঘটনা বাদাম চাষীকে খুলে বললো। চাষী তার সব কথা বিশ্বাস করলো। বিজ্ঞের মতো বললো :

–দুষ্টুমি করলে শাস্তি তো পেতেই হবে। তোমারও নিশ্চয়ই শিক্ষা হয়েছে। একটা কথা মনে রাখবে। বড়োরা যা করে, তা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই করে।

–হ্যা চাচা সব মনে থাকবে। এবার যে একটু উপকার করতে হয়।

–কি করতে হবে বলো।

–দেখতেই তো পাচেছন। গায়ে কোনো জামাকাপড় নেই। এভাবে তো বাড়ি যাওয়া যায় না। যদি একটা কাপড় দিতেন।

–থাকলে তো দিতামই। কিন্তু আমার এই একটাই কাপড় যা পরে আছি।

–তাহলে একটা বস্তা।

–বস্তায় তো বাদাম রেখেছি। কোনো খালি বস্তা নেই।

পিনোকিও দেখলো, চাষী তার ঘরের বেড়ার সঙ্গে একটা বাঘের চামড়া ঝুলিয়ে রেখেছে। ভাবলো, ওটা দিয়েই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বললো :

–যদি দয়া করে ঐ বাঘের চামড়াটা দিতেন তাহলে ওটা দিয়ে জামা জুতো টুপি বানিয়ে নিতাম।

চাষী আর না করতে পারলো না। অবশেষে সেই বাঘের চামড়া কেটে জামা-জুতো বানিয়ে তাই পরে পিনোকিও পরী-মার ঘরের দিকে যাত্রা করলো।

পিনোকিও ভয়ে ভয়ে পরী-মার ঘরের কাছে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে 'পরী-মা' 'পরী-মা' বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু দরোজা খুললো না। ভাবলো, পরী-মার কথামতো কাজ না করায় সে রাগ করে বসে আছে। তাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো :

–আমাকে মাফ করে দাও পরী-মা। আমি আর তোমার অবাধ্য হবো না। দয়া করে দরোজা খোলো। বাইরে খুব বৃষ্টি। ভিজে যাচ্ছি যে!

দরোজা খুলল না। তার মনে হলো পরী এখন ঘুমোচ্ছে। তাই সে দরোজায় ধরাম ধরাম করে লাথি মারতে শুরু করলো। দরোজা খুললো না কিন্তু ভেঙে গেল। ভেঙে গিয়ে হলো আরেক বিপদ। দরোজার পেরেকের সঙ্গে পিনোকিও-র এক পা আটকে গেল। অনেক টানাটনি করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

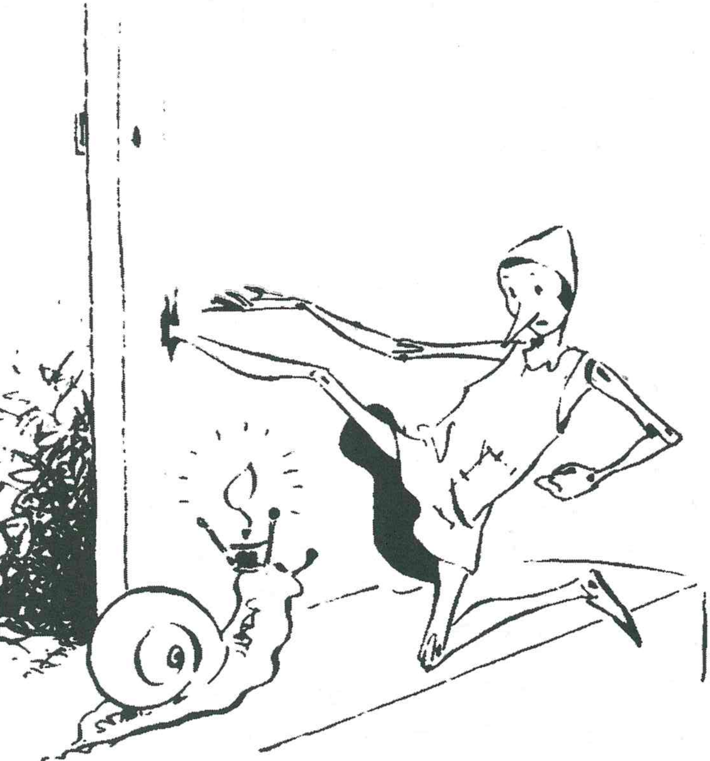

বন্ধুরা, কি মজার ব্যাপার দেখেছো? পিনোকিও-র এক পা মাটিতে, আরেক পা মাথার কাছে দরোজার কাঠে শক্ত করে আটকে আছে।

পাশের ঘরে বসে পরীর রানী সবকিছু দেখছিলো। কিন্তু কিছুই বললো না। ওর একটু শাস্তি হওয়া দরকার। বারবার শপথ করে যে শপথ ভঙ্গ করে তাকে এতো সহজে ক্ষমা করা উচিত হবে না।

পিনোকিও আকাশের দিকে এক পা তুলে কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলো না। এদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছিলো। পায়ের যন্ত্রণায় এবং ক্ষুধার জ্বালায় এক সময় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

পিনোকিও-র যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে সোনার খাটে শুয়ে আছে। মাথার কাছে বসে পরী-মা কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। খুশিতে তার চোখ দিয়ে বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে পানি ঝরতে লাগলো। 'পরী-মা' 'পরী-মা' বলে শিশুর মতো হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলো সে। কিছুতেই কান্না থামে না। পরী-মা তাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন :

–এবার তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার নিশ্চয়ই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এরপরও যদি অবাধ্য হও, তাহলে ...

পিনোকিও পরীর রানীর কথা শেষ করতে দিলো না। গলা জড়িয়ে ধরে কপালে গালে চুমু দিতে লাগলো। তারপর বললো :

*এবার আমার শিক্ষা হলো*
*মরার ছিলো বাকি।*
*কথা দিলাম পড়াশোনায়*
*আর দেবো না ফাঁকি।*

পিনোকিও সত্যি সত্যিই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলো। সারা বছর একটুও দুষ্টুমি করলো না। স্কুলের কারো সাথে ঝগড়া করলো না। শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলো এবং তাদের কথা মেনে চললো। তার এই পরিশ্রমের ফলও সে পেলো। বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হলো। স্কুলের সবচে' ভালো ছেলের পুরস্কারটিও পেলো সে।

পিনোকিও-র আচরণে পরীর রানী খুব খুশি হলো।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে আসার পর সে পিনোকিও-কে বললো :

–তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে পুতুল সোনা।

–কি সারপ্রাইজ? নিশ্চয়ই ছানার সন্দেশ করেছো।

–হলো না।

–তাহলে খাঁটি দুধের চমচম তৈরি করেছো।

–না রে লোভী ছেলে। কোনো খাবার নয়।

–তাহলে আমার জন্য কোনো নতুন টুপি-জুতো-জামা ।

–তুমি আর কাঠের পুতুল থাকবে না। তুমি একটা ভালো ছেলে হয়ে যাবে। ভালো মানুষ হবে।

পুতুলের সে কি আনন্দ। সে আর পুতুল থাকবে না? মানুষ হয়ে যাবে? আনন্দে গান ধরলো সে :

*এবার আমি মানুষ হবো*
*কাঠের পুতুল থাকবো না।*
*সৎ মানুষের সঙ্গে রবো*
*ভেজাল কিছু রাখবো না।*

পিনোকিও মানুষ হবে এ উপলক্ষে আয়োজন করা হচ্ছে বিরাট ভোজসভা। পরদিন তার স্কুলের বন্ধুবান্ধবসহ এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হলো। পরীর দেশ থেকে ডেকোরেটরের লোকজন এসে পরী-মার বাড়িঘর সাজাতে শুরু করলো।

এরই মধ্যে ঘটে গেল আরেক দুর্ঘটনা। আবার বিপর্যয় নেমে এলো পিনোকিও-র জীবনে।

## ত্রিশ

*কাল সকালে খাঁটি মানুষ হবে*
*আজ কেনো সে ঘরে বসে রবে?*
*মনের সুখে খেলার মাঠে এসে*
*পুতুল গেলো খেলাধুলার দেশে।*

বাড়িতে পরীর দেশের লোকজন এসে ঘর-দোর সাজাতে শুরু করেছে। পিনোকিও তার বন্ধুদের দাওয়াত করার জন্য বের হয়ে গেল। পরী-মা তাকে বারবার সাবধান করে দিলো যাতে পথে-ঘাটে কোথাও দেরি না করে। দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে যাতে গল্প করতে না বসে যায় সে বিষয়েও সাবধান করে দিলো। সে তার পরী-মাকে বারবার আশ্বস্ত করলো যে, সন্ধ্যার আগেই সে বাড়ি ফিরবে এবং বইখাতা নিয়ে পড়তে বসে যাবে। মানুষ হবে এই আনন্দে গান গাইতে গাইতে দিলো এক দৌড় :

*এবার আমি মানুষ হবো*
*কাঠের পুতুল থাকবো না।*
*সবাইকেই দাওয়াত দেবো*
*কাউকে বাকি রাখবো না।*

বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের দাওয়াত করতে করতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগলো। সবাই আনন্দের সঙ্গেই দাওয়াত কবুল করলো এবং পিনোকিও-র জন্য শুভকামনা জানালো। বন্ধুরা অনেকেই খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলো। সে খাবারের একটা বিশাল তালিকা তুলে ধরলো। যা কিছু মনে এলো তার কিছুই বাদ গেল না। এমন কি মনের ভুলে কিছু অখাদ্যের কথাও সে বলে ফেললো। বন্ধুরা অতোটা খেয়াল করলো না। কারণ ভুঁড়িভোজ হবে এই আনন্দে সবাই একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলো।

পটকা নামে পিনোকিও-র একটা বন্ধু ছিলো। একটু রোগা পাতলা বলেই তার নাম পটকা। সে ছিলো দুষ্টের শিরোমণি। সেই কারণেই সে গত এক বছর পটকার সঙ্গে তেমন মেশে নি। কিন্তু এমন আনন্দের দিনে তো আর বন্ধুকে ভুলে থাকা যায় না। চারবার বাড়ি গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না। সবগুলো খেলার মাঠ ঘুরল। পটকা নেই। ভাবলো : পটকাটা যেখানেই থাকুক, ওকে খুঁজে বের করে দাওয়াত দিতে হবে। নানা জায়গায় খুঁজতে লাগলো সে। আমবাগান, কাঁঠালবাগান, তরমুজ-ক্ষেত, শশা-ক্ষেত এমন কি বাঙ্গি-ক্ষেতও বাদ দিলো না। কিন্তু কোথাও পটকার টিকিটিরও দেখা নেই। পিনোকিও-র একবার মনে হলো : আর খুঁজে লাভ নেই। পরক্ষণেই ভাবলো :

–আমাদের বাড়িতে সবাই কতো রকমের খাবার খাবে। আর বেচারা পটকা বাড়িতে আলুভর্তা ডাল খেয়ে ঘুমাবে? না। এটা হতে পারে না। আরো একটু খুঁজে দেখা যাক।

আবার পটকাকে খুঁজতে শুরু করলো। অবশেষে তাকে পাওয়া গেল পাশের গ্রামের একজন কৃষকের ভেড়ার পালের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

–পটকা তুমি এখানে? আর আমি তোমাকে সারা গ্রাম খুঁজে খুঁজে হয়রান।

–এতো খোঁজাখুজির কারণ কি কাঠের পুতুল? তুমি তো আমাকে সহ্যই করতে পারো না। আজ কি মনে করে খুঁজছো?

–আগামীকাল আমাদের বাড়িতে তোমার দাওয়াত। আমি সত্যিকার মানুষ হতে যাচ্ছি। এ উপলক্ষে সবাইকে নিমন্ত্রণ করছি। তুমি আসবে কিন্তু।

–আমি দুঃখিত বন্ধু। আগামীকাল আমি আসতে পারছি না। তোমার জন্য শুভকামনা।

–কেন আসতে পারবে না? কাল তুমি কোথায় যাবে?

–কাল নয়, আমি আজ রাতেই চলে যাচ্ছি।

–কোথায়?

–সে এক নতুন দেশ। সে দেশ তোমার ভালো লাগবে না। তুমি তো আবার বইয়ের পোকা। মায়ের কথায় উঠো আর বসো। নিজের ইচ্ছে বলে তোমার কিছু নেই।

–আহা, কোন দেশে যাচ্ছো তাই বলো না!

–খেলাধুলার দেশে। অবশ্য এই দেশের আরো একটা নাম আছে। ইচ্ছেপুরী। সেখানে যখন যা ইচ্ছে তাই করা যায়। কেউ বাধা দেয় না।

–এ যে দেখছি আজব দেশ।

–সেখানে যাবো বলেই তো এখানে লুকিয়ে আছি। সবাই আমার সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু আমি তো সবাইকে নিতে পারবো না। তোমাকে ভালোবাসি বলেই কথাটা তোমাকে খুলে বললাম। তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

–না, না, অসম্ভব। আমার বাড়িতে এতো বড়ো অনুষ্ঠান। আমি ভাই এসবের মধ্যে নেই। আমি সত্যিকার মানুষ হতে চাই।

–তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? চোখের সামনেই তো মানুষের দুরবস্থা দেখছো। রাতদিন পরিশ্রম করেও ঠিকমতো খাবার পায় না। খাবার-দাবার, জমিজমা, সহায়-সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াবিবাদ, মারামারি, হানাহানি। এক মানুষ আরেক মানুষের সবকিছু লুটপাট করছে। কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই এটা ওটা চুরি করছে। মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বলছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ পুষছে, নিজের দেশকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। তারপরও তুমি মানুষ হতে চাও? তার চেয়ে আমার সঙ্গে সেই ইচ্ছেপুরীতে চলো। হেসে খেলে জীবন পার করে দিতে পারবে। সেখানে তোমার কোনো শত্রু নেই। কেউ তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না।

পটকার কথাগুলো পিনোকিও মন দিয়ে শুনলো। পটকা যা বলেছে তা তো মিথ্যে নয়। মানুষ আসলে অশান্তিতে আছে। সবার মুখেই কেবল 'নেই নেই' 'চাই চাই' রব। যার যা আছে তা নিয়ে সে খুশি নয়, সুখি নয়। পটকার কাছে জানতে চাইলো :

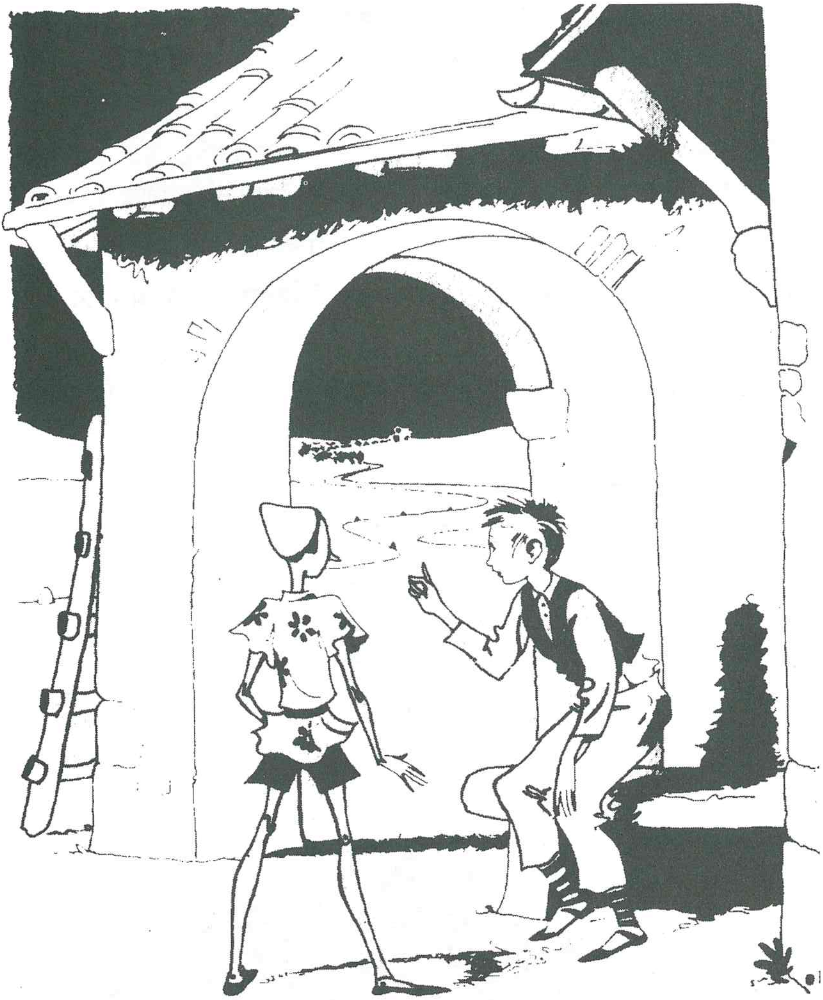

–সেই ইচ্ছেপুরী যাওয়ার গাড়ি কখন আসবে?

–এই এলো বলে। আমি তোমার ভালো চাই বলেই তোমাকে সঙ্গে নিতে চাইছি।

–সেখানে কি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নেই? মায়ের শাসন, বাবার বকুনি, শিক্ষকদের বকবকানি?

–অসম্ভব। তাহলে কি আমি সেখানে যাই? পড়ালেখার ভয়েই তো আমি ইচ্ছেপুরীতে যাচ্ছি। সেখানে অনন্ত ছুটি। কাজের মধ্যে কাজ দুইটি– খাওয়া আর ঘুম। ঘুম আর খাওয়া।

পিনোকিও-র খুব লোভ হলো। খেলাধুলার দেশ যেন স্বর্গের মতো। সেখানে কোনো কাজ করতে হবে না। ইচ্ছের পালে হাওয়া দিয়ে উড়ে বেড়ানো যাবে।

বলতে বলতে একটা গাড়ির হর্ন শোনা গেল। পটকা চিৎকার করে বললো :

–গাড়ি এসে পড়েছে। আমি কিন্তু এখনি গিয়ে উঠে পড়বো। তুমি যাবে কিনা বলো?

–সেখানে সত্যিই পড়াশোনা নেই? কাজ করতে হয় না? যা খুশি তাই পাওয়া যায়, খাওয়া যায়?

–হ্যা হ্যা তাই। তাহলে তুমি যাচ্ছো?

পিনোকিও মনের অজান্তেই গান গেয়ে উঠলো :

*হায়রে মজার ইচ্ছেপুরী*
*খেলাধুলার দেশ*
*খাই দাই ঘুরি ফিরি*
*বেশ বেশ বেশ।*

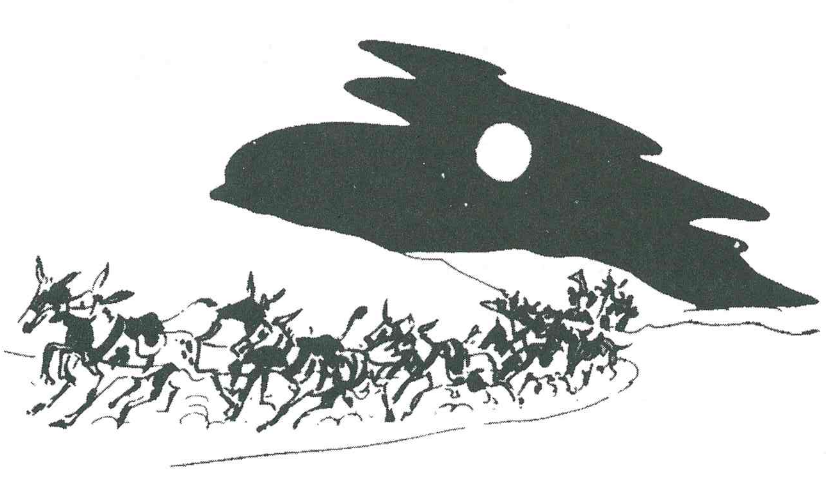

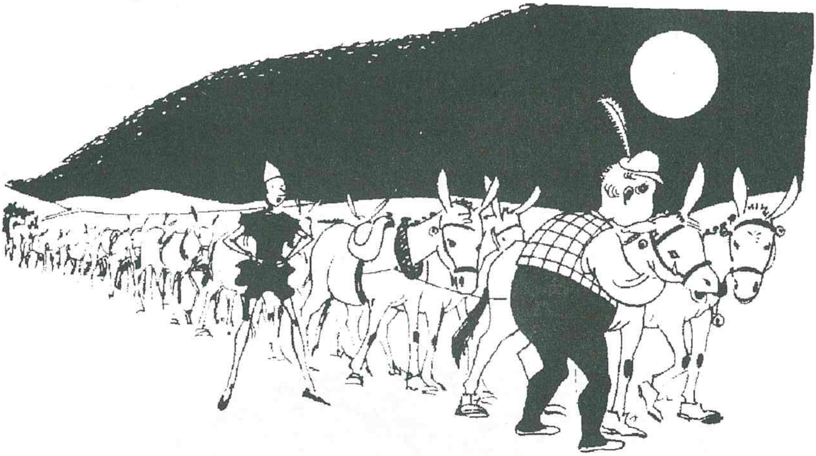

## একত্রিশ

*ঘুমের পরে খাওয়া, খাওয়ার পর গান*
*গাধার মতো তার হয়ে গেলো কান।*
*লেজ গজানোর পরে বোকারাম হাঁদা*
*একদিন পিনোকিও হয়ে গেলো গাধা।*

পিনোকিও সবকিছু ভুলে গেল। বাবার কথা আজকাল খুব কমই মনে পড়ে তার। পরী-মার আদর-সোহাগ-ভালোবাসায় সে সত্যিকারের মানুষ হতে যাচ্ছিলো। কিন্তু এক মুহূর্তের আনন্দ ও উত্তেজনায় সে সবকিছু ভুলে গেল। গান গাইতে গাইতে সে পটকার সঙ্গে সেই গাড়িতে গিয়ে বসলো।

গাড়িতে প্রায় শ'খানেক ছেলে ছিলো। তাদের অনেককেই পিনোকিও চেনে। এই দুষ্টু বিচ্ছুগুলো গাড়িতে বসে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো। কাঠের পুতুল সেই ভিড়ের মধ্যে কিছুতেই টিকতে পারছিলো না। গাড়ির চালক পিনোকিও-কে নিজের আসনে বসিয়ে নিজে হেঁটে চললো। পিনোকিও ভাবলো, বেচারা চালক এভাবে পায়ে হেঁটে যাবে!

–চালক ভাই, আপনি চালকের আসনে বসুন। আমি না হয় গাধার পিঠে গিয়ে বসি।

বলেই লাফ দিয়ে গাধার পিঠে গিয়ে বসলো সে। গাধাটা ছিলো খুবই দুষ্টু। পিনোকিও বসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে এমন ঝাঁকি দিলো যে, বেচারা কাঠের পুতুল রাস্তার পাশে রাখা গোবরের মধ্যে গিয়ে ধপাস করে পড়লো। গাড়ির সবাই হাঁ হাঁ করে হাসতে শুরু করলো।

কোনো কথা না বলে পিনোকিও আবার সেই গাধার পিঠে গিয়ে বসলো। বসেই সে তার শক্ত পা দিয়ে গাধার পেটে একটা গুঁতো মারলো। গুঁতো খেয়ে গাধা হি হি হি হেসে উঠেই গাড়ি নিয়ে জোরে দৌড় দিলো। গাড়ির সবাই একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বন্ধুরা, তোমরা কি বুঝতে পারছো গাধাটা হি-হি-হি করে উঠেছিলো কেন? পারলে না? আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি। গাধার পেটে সুড়সুড়ি লেগেছিলো বলে হি-হি-হি করে হেসে উঠেছিলো। আর পুতুলের কাঠের পায়ের গুঁতোয় ব্যথা পেয়েছিলো বলে জোরছে দৌড় দিয়েছিলো।

পিনোকিও শক্ত করে গাধার কান ধরেও ছিলো। তাই তার কিছুই হলো না। মনে মনে ভাবছিলো : আজ থেকে সব রকম শাসন বারণ থেকে সে মুক্ত। কি লাভ ভালো মানুষ হয়ে? ভালো মানুষদের বিপদই তো বেশি। ভালো মানুষকেই নানা রকম ঝামেলা পোহাতে হয়। ভালো মানুষকে কেউ শান্তিতে থাকতে দেয় না।

এমন সময় মনে হলো কে যেন তার কানের কাছে করুণ সুরে গাইছে :

*ফিরে যা তুই মায়ের কাছে*
*তোর কপালে কষ্ট আছে।*
*ইচ্ছেপুরীর দেশে*
*মরবি অবশেষে?*

এদিক সেদিক সামনে তাকিয়ে কাউকে খুঁজে পেলো না। পিছনে বিচ্ছুর দল হৈ হৈ রৈ রৈ করছে। এই গানের গলা তো তার চেনা মনে হচ্ছে না। খুবই কর্কশ এবং বাজে গলা। এ তো গান নয় যেন গর্জন। পিনোকিও চিন্তায় পড়ে গেল। চালকের আসনে বসে চালক বেচারা ঘুমোচ্ছে। গাধার গাড়ি ইচ্ছেমতো এগিয়ে চলছে। মনে হলো সেই ইচ্ছেপুরীতে যাওয়ার পথঘাট চালকের চেয়ে গাধাই ভালো চেনে। আবার সেই গান শোনা গেল :

*ওরে পুতুল বোকা ছেলে*
*খেলাধুলার দেশে গেলে*
*চোখের জলে ভাসবি রে*
*ফিরে কি তুই আসবি রে!*

এই হেড়ে গলায় গান শুনে পিনোকিও-র মেজাজই গেল খারাপ হয়ে। আবার সেই উপদেশ? অসহ্য। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া বদমাশকে তো খুঁজে বের করতে হবে। ভালো করে আগে পিছে উপরে নিচে খুঁজতে লাগলো সে। হঠাৎ মনে হলো গাধার মুখ যেন নড়ছে। আর দুই চোখ বেয়ে ঝর্ণার মতো পানি ঝরছে।

পিনোকিও বুঝতে পারলো এই গাধাই এতোক্ষণ গান গেয়ে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করছে।

পিনোকিও চালককে জিজ্ঞেস করলো :

–এই যে চালক ভাই তোমাদের গাধাও দেখি গান জানে। ভালো কথা গান আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু গাধাটা কাঁদছে কেনো ভাই?

–গতকাল ওর বউ মারা গেছে। সেই আনন্দে কাঁদছে। বউটা খুব দজ্জাল ছিলো। দিনরাত কানের কাছে প্যানপ্যান করতো।

–সে কি কথা! গাধা কি আনন্দে কাঁদছে?

–গাধা আনন্দে কাঁদে আর মনের দুঃখে হাসে। এই জন্যই তো এদের গাধা বলা হয়।

–কি সব উল্টাপাল্টা নিয়ম রে বাবা!

–তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানেও সবকিছু উল্টাপাল্টা।

–বলো কি?

–আমরা তো ইচ্ছেপুরীতে এসেই পড়েছি। তুমি নিজের চোখে দেখলেই বিশ্বাস করবে।

ইচ্ছেপুরীতে প্রবেশ করেই পিনোকিও-র চোখে পড়লো হাজার হাজার ছেলে যে যার মতো খেলছে। কতো রকমের খেলা! ফুটবল, ক্রিকেট হা-ডু-ডু, লুডু, দাবা, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, টেনিস, গল্‌ফ, বউচি, লুকোচুরি, দাড়িয়া বান্ধা, গোল্লাছুট আরো নাম না জানা অনেক খেলা। কেউ কেউ আবার গান গাচ্ছিলো। কতো রকমের গান যে! কেউ কারো গান শুনছে না। যে যার মতো চিৎকার চেঁচামেচি করেই চলছে। কেউ কেউ আবার হাতাহাতি গুতাগুতি মারামারি গড়াগড়িও করছিলো। মজার ব্যাপার হলো, এখানে অধিকাংশ ছেলেই আকাশে পা তুলে হাত দিয়ে হাঁটছে বা দৌড়াচ্ছে। এ যেন উল্টা পাল্টা সিক্সটি নাইন। যেতে যেতে বিভিন্ন ভবন চোখে পড়লো। ভবনগুলোর নামও দেখি উল্টা করে লেখা!

গাধার গাড়ি সেই খেলাধুলার দেশে পৌঁছামাত্রই সবাই ছুটে এসে গাড়ির সবাইকে স্বাগত জানালো। কিন্তু ফুল দিয়ে বরণ করার পরিবর্তে ওরা সবাই

গোবর ছিটাতে শুরু করলো। আর ওদের বরণ-সঙ্গীত খুবই বিস্ময়কর। গোবর ছিটাতে ছিটাতে সবাই গেয়ে উঠলো :

*জ্ঞান বুদ্ধি ধ্বংস হোক*
*মাথা ভরা গোবর।*
*কখন যে গাধা হবে*
*থাকবে না খবর।*

পিনোকিও-র মনে হলো দুষ্টু ছেলেরা মজা করে এসব বলছে। মানুষ কি কখনো গাধা হয় নাকি! যাই হোক, এই আনন্দ আয়োজন বেশ উপভোগই করলো সে।

দেখতে দেখতে সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বন্ধুরাই তাকে এই ইচ্ছেপুরীর নিয়মকানুন শিখিয়ে দিলো। পিনোকিও

মনোযোগ দিয়ে নিয়মকানুন মনে রাখার চেষ্টা করলো। বিশেষ করে খেলাধুলার নিয়মগুলো। খেলতে, খেতে আর ঘুমাতেই তো তার এখানে আসা।

পটকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল পিনোকিও-র। দুষ্টু ছেলে বলে ওর সঙ্গে সে খেলাধুলা করতো না। অবশ্য স্কুলের শিক্ষকরাই বলতেন : পটকার সঙ্গে মিলবে না, খেলবে না, বলবে না, চলবে না। সেই পটকাই আজ তার কতো বড়ো উপকার করলো। আসলে বাবা মা এবং শিক্ষকরা ছোটদের ভালো দেখতে পারে না। নিজেরা বুড়ো হয়েছে বলে ছোটদের আনন্দে ওদের হিংসে হয়। পটকার মতো ভালো ছেলে আর হয় না।

এমনি করেই হেসে-খেলে-খেয়ে-গেয়ে দিন যায়, রাত যায়। আহা, কতো সুখ! সুখের এই বাড়াবাড়িতে বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝড়ও ওঠে। তখন ছুটে গিয়ে পটকাকে জড়িয়ে ধরে বলে :

*ওরে আমার প্রাণের বন্ধু পটকা ভাই*
*খেলাধুলার দেশে সুখের অন্ত নাই।*

এভাবেই মাস সাতেক অতিক্রান্ত হলো। একদিন ঘুম থেকে উঠে কান চুলকাতে গিয়ে পুতুল তো অবাক। তার একি অবস্থা!

পিনোকিও কানে হাত দিয়ে হায়! হায়! করতে লাগলো।

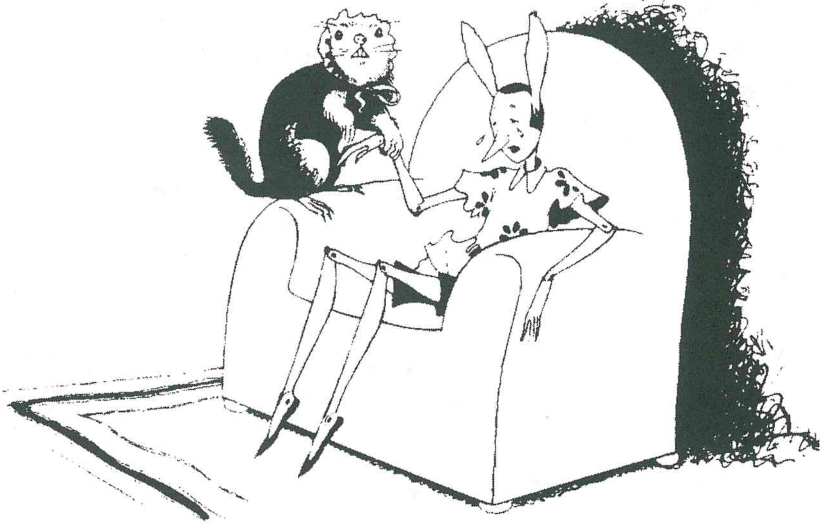

## বত্রিশ

*পিনোকিও-র লেজ গজিয়ে*
*গায়ে হলো লোম ।*
*গাধার মতো হেঁড়ে গলায়*
*ডাকছিলো একদম ।*

পিনোকিও-র কানের অবস্থা দেখলে তোমাদের হয়তো হাসি পাবে । কিন্তু বেচারা পিনোকিও একেবারে ভেঙে পড়লো । এক রাতের মধ্যে গাধার মতো লম্বা কান হয়ে গেল তার! এই আঠারো ইঞ্চি লম্বা কান নিয়ে সে এখন কি করবে? এতো দেখছি মহা বিপদ হলো ।

তোমরা তো জানোই কান এবং নাক চোখের এতো কাছে হলেও আয়না ছাড়া তা দেখার উপায় নেই । কিন্তু এই উল্টাপাল্টা সিক্সটি নাইনের দেশে পিনোকিও আয়না পাবে কোথায়?

অবশেষে ঘরের পাশেই একটা কূপ চোখে পড়লো । পিনোকিও সেই কূপের পানিতে নিজের চেহারা দেখে তো অবাক! কূপের পানিতে ওটা কার ছবি? উপরে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই । তাহলে এটা তারই ছবি? হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলো সে । কাঁদতে কাঁদতে সে তার কান আরো ইঞ্চি দুয়েক বাড়িয়ে নিলো । যদিও সে ব্যাপারটা খেয়াল করলো না । তবে গায়ে যে গাধার

মতোই লোম গজাত শুরু করেছে তা তার দৃষ্টি এড়ালো না। হায় সে কি কান্না পিনোকিও-র! চোখের জলে কূপের পানি এক হাত বেড়ে গেল।

পুতুলের কান্না শুনে একটা ইঁদুর ছুটে এলো।

–তুমি কাঁদছো কেনো গাধা ভাই?

পিনোকিও অবাক হয়ে গেল। এই হতচ্ছাড়া ইঁদুর বলে কি! গাধা ভাই! মেজাজ খারাপ হয়ে গেল পিনোকিও-র। ধমকের সুরে বললো :

–মুখ সামলে কথা বলো। তোমার তো সাহস কম নয়! তুমি আমাকে গাধা বলছো?

–আহা রাগ করছো কেন ভাই? আজ হোক কাল হোক তুমি তো গাধা হবেই। এছাড়া তুমি যদি অন্ধ না হতে তাহলে নিজেই বুঝতে পারতে যে, গাধার অনেক লক্ষণই তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

–তুমি কিন্তু সীমা লজ্ঘন করছো। একবার গাধা বলেছো সহ্য করেছি। এখন আবার অন্ধ বললে?

–তুমি তো অন্ধই। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ। একটা গান আছে না, 'হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ'। তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছো। তুমি একটা কাঠের পুতুল। কিন্তু তোমার জীবনে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সুযোগ এসেছিলো। সে সুযোগ তুমি অবহেলায় হারিয়েছো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত গাধা হয়ে যাবে।

–এখন আমার কি হবে ভাই? এখন আমি কি করবো।

–তোমার আর কিছুই করার নেই। গাধা যা করে, তুমিও তাই করবে। তোমার জানা উচিত ছিলো, যারা অবাধ্য, বেয়াদব এবং বিশ্বাসঘাতক, তাদের পরিণতি কখনো ভালো হয় না। তুমি তোমার পরী-মার সঙ্গে ছলনা করেছো। বাবাকে কষ্ট দিয়েছো। শিক্ষকদের কথা না শুনে দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে এই খেলার দেশে এসেছো। পড়ায় ফাঁকি দিয়ে যারা দুষ্টুমি করে তারা গাধা হয়ে যায়।

–কিন্তু আমি তো আসতে চাই নি। আমার বন্ধু পটকা নানা ফন্দি ফিকির করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। পটকা খুব দুষ্টু ছেলে।

–তাই যদি হয় তাহলে পটকার সঙ্গে তোমার মেলামেশা করা উচিত হয় নি। সে যাই হোক, তুমি বোকামি করেছো, শাস্তি পাবে।

–আমার মাথায় তো বুদ্ধি নাই। কাঠের মাথায় কি কোনো বুদ্ধি থাকে? বুদ্ধি থাকলে কি আর পরী-মাকে ছেড়ে ঐ বদমাশ পটকার সঙ্গে এখানে আসি! ওর

জন্য আমার এই দুর্দশা। আমি ওকে ছাড়বো না।

পটকার খোঁজে পিনোকিও বাইরে বের হয়ে এলো। কিন্তু রাস্তায় এসে পড়লো আরেক ঝামেলায়। এক দুষ্টু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তাকে এটা সেটা বলে তাড়াতাড়ি বিদায় করলো। পাছে কানের কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এভাবে কয়জনকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব?

এতো বড়ো কান দেখে লোকে কি বলবে এই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে একটা বড়ো মানকি ক্যাপ বা বানর টুপি দিয়ে কান ঢেকে

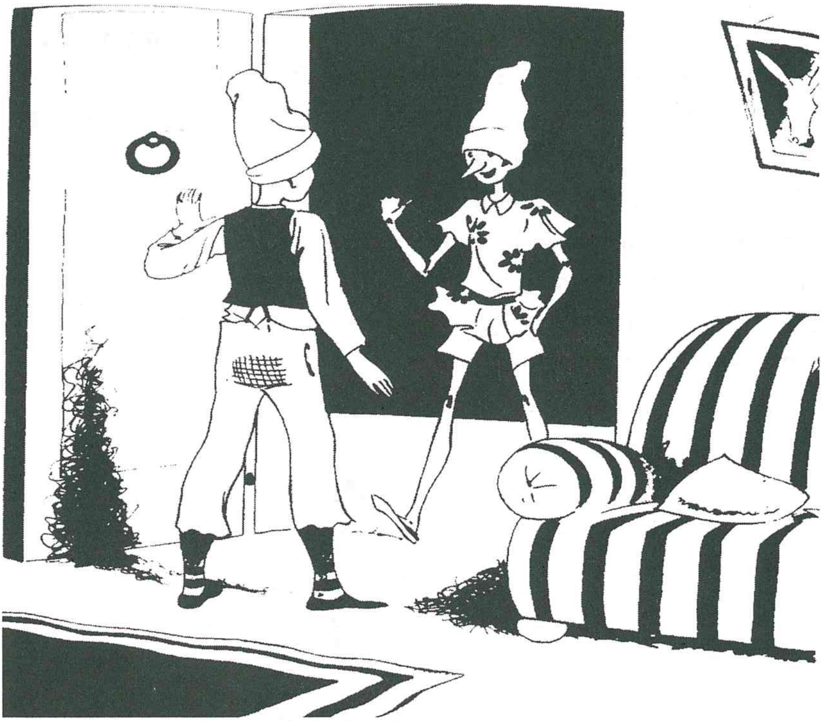

এবং সারা শরীরে একটা চামড়ার চাদর জড়িয়ে পটকার খোঁজে বের হলো। সারা ইচ্ছেপুরী তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। পটকা কোথাও নেই। ক্লান্ত হয়ে একটা কলাবাগানের পাশে বসে পড়লো পিনোকিও। পাশের একটা কলাবাগানের দিকে তাকিয়ে পিনোকিও অবাক। সেই কথাবাগানে বসে পটকা বানরের মতো পাকা কলা খাচ্ছে।

পটকার গায়েও গাধার মতো লোম গজিয়েছে। আর তার কান দু'টো যেন গাধার কানের চেয়েও লম্বা।

পিনোকিও-কে দেখে সে ধীরে ধীরে কলাবাগান থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। দুজন দুজনের গলা জড়িয়ে সে কি কান্না!

কাঁদকে কাঁদতেই একজন আরেকজনের কান ধরে টানতে লাগলো। আর টানাটানির এক পর্যায়ে গাধার মতো চি-হিহি চি-হিহি করতে করতে হাসতে শুরু করলো। তাদের দুজনের হাতই পা হয়ে গেল এবং চারপায়ে হাঁটতে লাগলো।

বন্ধুরা, তোমরা তো বুঝতেই পারছো যে, পিনোকিও এবং পটকা গাধা হয়ে গেছে। দুজনের শরীরই ভারি হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও আর আগের মতো দুই পায়ে দাঁড়াতে পারলো না। বসতে গিয়ে খেয়াল করলো দুজনেরই পিছন দিকে গাধার লেজের মতোই লেজ গজিয়েছে। কথা বলতে গিয়ে দেখলো, মুখ দিয়ে গাধার মতো শব্দ বের হচ্ছে।

পিনোকিও ও পটকা হতভম্বের মতো সেই কলাবাগানের পাশে গাধার মতো করেই বসে বসে লেজ নাড়াতে লাগলো। তারপর ঘাস খেতে শুরু করলো তারা। হঠাৎ পিছন দিকে কার যেন পায়ের শব্দ শুনলো। পিছনে তাকিয়ে দেখে : সেই চালক এসে দাঁড়িয়েছে।

এই চালকের গাধার গাড়িতেই তারা এই খেলার দেশে এসেছিলো।

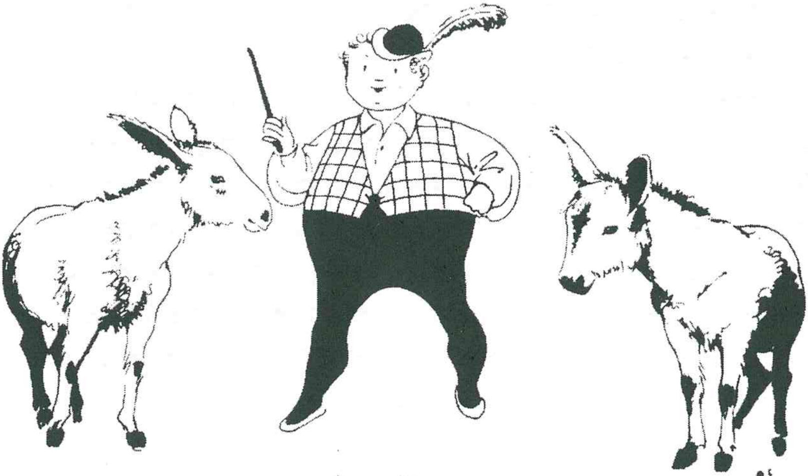

# তেত্রিশ

*কাঠের পুতুল পিনোকিও সার্কাসের এক গাধা*
*খরকুটো আর ঘাসবিচালি খায় সে আধা আধা।*
*এক রাতে সে খোঁড়া হলেই বিক্রি হয়ে যায়*
*নয়া মালিক চামড়া দিয়ে ঢোল বানাতে চায়।*

চালক গাধা দুটোকে এক সঙ্গে পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগলো। বিশ্রী বেটে ও মোটা এই চালকের নাচ দেখে রাগে পটকা ও পিনোকিও-র গা জ্বলে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাগ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই জেনে লেজ গুটিয়ে বোকার মতো বসে রইলো তারা।

চালক ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলো। বিশাল একটা চিরুনি দিয়ে ওদের গায়ের লোম মসৃণ করে দিলো। অবাধ্য গাধা দুটোকে সে ভদ্র গাধায় পরিণত করলো। তারপর গলায় লাগাম পরিয়ে গাধার হাটে বিক্রি করতে নিয়ে গেল।

দেখতে সুন্দর সুঠাম এবং নাদুস নুদুস হওয়ায় অনেক ক্রেতাই পটকা-পিনোকিও-র চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ালো। ফলে চড়া দামে বিক্রির একটা সুযোগ পেলো সে। একজন যা বলে অন্যজন তার চেয়ে বেশি বলে। খেলার দেশের গাধার গাড়ির চালকের আনন্দ আর ধরে না। অবশেষে একজন

কৃষকের কাছে বিক্রি হয়ে গেল পটকা। আর পিনোকিও-কে কিনে নিলো একজন সার্কাস দলের মহাজন।

সার্কাসের মহাজন চিন্তা করলো, এই গাধাটাকে ঠিক মতো ট্রেনিং দিতে পারলে তার দলের সুনাম এবং ব্যবসায় উন্নতি হবে। পিনোকিও-কে পছন্দ করার কারণ হলো গাধার হাটে সে খুব নড়াচড়া করছিলো এবং নানাভাবে লেজ নাড়িয়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করছিলো। সার্কাসের মহাজনের মনে হলো এটাকে নাচ শেখাতে তেমন কষ্ট হবে না। নাচের সঙ্গে দুচারটা গান যদি শেখানো যায় তাহলে তো কথাই নেই। পিনোকিও-কে লাগাম ধরে টানতে টানতে বাড়ির দিকে হেঁটে চললো সে। যেতে যেতে গুনগুন করে গাইতে লাগলো :

*তোকে আমি নাচ শেখাবো*
*অনেক অনেক টাকা পাবো।*

পটকা গাধার একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কৃষকের বাড়ি গিয়ে সে খড়-বিচালি-ঘাস খেয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলো। কৃষক সকাল বেলা পটকার গলায় লাঙল বেঁধে জমি চাষ করতে যায়। ফিরে সেই সন্ধ্যাবেলা। এমন খাটুনিতে বেচারার গায়ের লোমগুলো ঝরে পড়তে লাগলো। কৃষকের বাড়ির দুষ্টু ছেলেরা তাই তার পিঠে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আর ছড়া কাটে:

*ছোলা গাধা ছোবড়া খাও*
*লাঙল নিয়ে ক্ষেতে যাও।*

প্রথম প্রথম ঘাড় বাঁকিয়ে বাচ্চাদের গুঁতা দেয়ার চেষ্টা করতো। তাতে ফল হতো উল্টো। পিঠের ওপর ঠাস ঠাস করে কাঁচা কঞ্চি এসে পড়তো। এখন সে চোখ বুঝে সব অপমান সহ্য করে। অধিক পরিশ্রমে বেচারা পটকার ঘাড়ের চামড়া উঠে গেল। বুঝো তো বন্ধুরা, গাধার খাটুনি বলে কথা।

চলো বন্ধুরা, এবার আমরা পিনোকিও-র খবর নিয়ে আসি। বাজার থেকে এনেই তাকে রাখা হলো গাধার ঘরে। খেতে দেয়া হলো খুদ, কুঁড়া ও ভুসি দিয়ে রান্না করা পায়েস। খাবার দেখে একটু খুশিই হলো সে। ভাবলো পায়েস যখন, তখন তো নিশ্চয়ই চিনি দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেতে দিয়ে মুখের চেহারা গেল পাল্টে। চিনি তো দূরের কথা, লবণও দেয়া হয় নি। থুথু করে খাবারটুকু ফেলে দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বসে রইলো। মালিক ভাবলো, এই গাধা বুঝি শুকনো খাবার চাচ্ছে। তাই কতোগুলো বিচালি এনে মুখের সামনে রাখলো।

পিনোকিও লাথি দিয়ে সেগুলো নিচে ফেলে দিলো। মালিকের মেজাজ তখন চড়ে গেল। হাতের লাঠিটা সপাং করে পড়লো পিনোকিও-র পিঠের ওপর। ক্ষুধা, লজ্জা এবং অপমানে সে কাঁদতে শুরু করলো। মজার ব্যাপার কি জানো? সেই কান্নায় গাধার মতোই ঘিঁ-ঘঁ ঘিঁ-ঘঁ শব্দ হচ্ছিলো। একটু মায়া হলো মালিকের। গলায় ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো : কাঁদিস নে গাধা। কিছু খেয়ে নে। না খেলে শক্তি পাবি কোথায়? শক্তি না থাকলে নাচবি কেমন করে?

পিনোকিও ঘিঁ-ঘঁ ঘিঁ-ঘঁ করতে করতে বললো :

–ঘিঁ-ঘঁ ঘিঁ-ঘঁ। খুদ-কুঁড়া-খড়-বিচালি খাবো না।

–তাহলে কি তোমার জন্য জিলাপি-সন্দেশ-রসগোল্লা আনবো নাকি?

–ঘিঁ-ঘঁ ঘিঁ-ঘঁ।

মালিক ভাবলো, গাধা বুঝি হ হ হ হ করছে। অর্থাৎ, হ্যা আমি তাই খাবো। রাগে গায়ে আগুন ধরে গেল। তবে রে! দেখাচ্ছি মজা। বলেই পিঠের ওপর সপাং সপাং লাঠি বসিয়ে গাধার ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিলো।

বেচারা পিনোকিও কাঁদতে শুরু করলো। চোখের পানিতে পায়ের কাছে ফেলে দেয়া বিচালিগুলো ভিজে গেল। সেই ভেজা বিচালি চিবুতে চিবুতে কপাল চাপড়াতে লাগলো। আর গুনগুন করে বললো :

*এই ছিলো কপালে লেখা*
*গাধার ঘরে ঘুমাই একা।*
*লেখাপড়া করি নি তাই*
*খড়-ঘাস-বিচালি খাই।*

সকাল বেলা মালিক এসে দেখলো গাধার পায়ের কাছের বিচালিগুলো নেই। খুব খুশি হলো সে। ওষুধে কাজ হয়েছে মনে হয়। কথায় বলে না, লাঠির ওপর ওষুধ নাই! কিন্তু শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য তো সে গাধা কিনে নাই। এই গাধাই হবে তার উপার্জনের উপায়। পিনোকিও-র পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললো :

–তোকে তো আমি মারতে চাই না। কিন্তু কথা না শুনলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবি। আর আমি যেভাবে যা করতে বলবো তাই করবি। আমি হলাম সার্কাসের ওস্তাদ। তোকে আমি দক্ষ গাধা-

শিল্পী বানাবো। তোর নাচ-গান অভিনয় দেখে সবাই হাতে তালি দেবে। 'সাবাস' 'সাবাস' বলে লোকজন চিৎকার করবে, বাহবা দেবে। আমার ব্যবসার সুনাম হবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি বড়োলোক হয়ে যাবো। আমি শিল্পী মানুষ। আমি তো আর লোক ঠকিয়ে টাকা নিতে পারি না। ওরা পয়সা খরচ করে সার্কাস দেখতে আসবে। ওদের যদি আমোদ দিতে না পারি, তাহলে আমার দুর্নাম হবে যে! কি কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো।

মালিক সুর করে বলতে শুরু করলো :

*দুই পায়ে দাঁড়াবি*
*লেজটাকে নাড়াবি।*
*সামনে ঠ্যাং নিবি*
*আমাকে ল্যাং দিবি।*
*গুতিয়ে হাঁড়ি ভাঙ্*
*গান গাবি চুং চাং।*
*যা চাকার ভেতরে*
*লাগবে না গতরে।*
*লাগামে দিলে টান*
*নেড়ে দে দুই কান।*
*পিঠে দুই থাপড়ে*
*চার পা-ই ওপরে।*
*ঘাড়ে দিলে চুমা*
*চোখ বুজে ঘুমা।*
*যদি বলি টা টা*
*নেড়ে দিবি পা-টা।*
*লেজ নেড়ে নেড়ে*
*ফিরে যাবি ঘরে।*

পিনোকিও মাস তিনেক এইসব কৌশল ও কসরত প্র্যাকটিস করলো। ভুল করেছে আর সপাং সপাং চাবুকের শব্দ হয়েছে। সব যখন শেখা শেষ হলো তখন মালিকের যে কি আনন্দ তা তোমাদের বলে বুঝাতে পারবো না। তার দীর্ঘদিনের সাধনা পূর্ণ হয়েছে। একটি গাধাকে সে মনের মতো করে গড়তে

পেরেছে। গাধাকে বশে আনাই দেখি সহজ। মানুষ কথা শোনে না। গাধাটা সত্যিই খুব ভালো। কতো সহজেই সব কিছু শিখে ফেললো। অল্পদিনেই সার্কাসের দলটি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

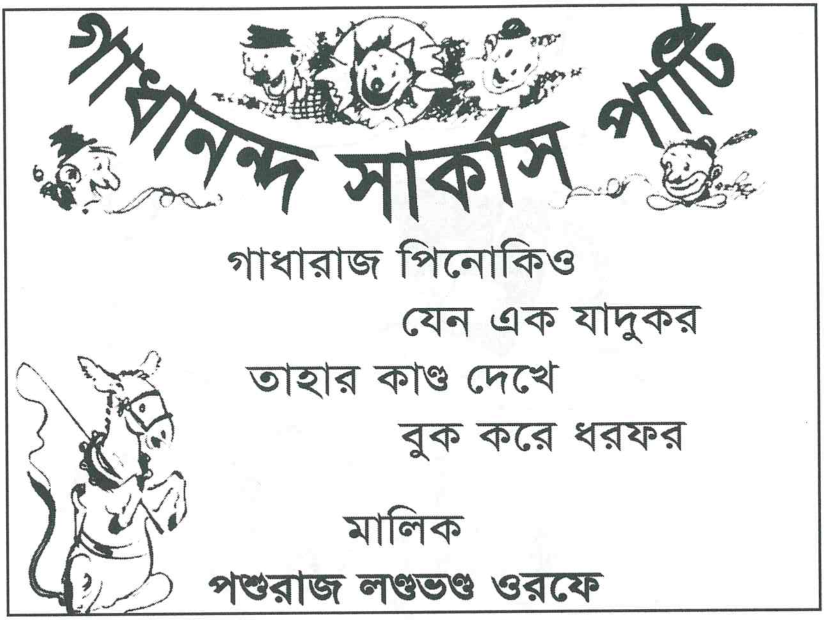


অবশেষে আয়োজন করা হলো সার্কাস পার্টির। ঢোল খোল বাজিয়ে দশ গেরামের লোকজনকে জানিয়ে দেয়া হলো। নানা রঙের কাগজে গাধার বিভিন্ন খেলার বিবরণ দিয়ে প্রচারপত্র তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দেয়া হলো।

হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলো সেই সার্কাস দেখার জন্য। চেয়ারে জায়গা না হওয়ায় মানুষ খড়কুটো-বিচালির ওপর বসলো। বসতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলো আরো কয়েক হাজার। যথাসময়ে শুরু হলো সার্কাস।

সার্কাস মাস্টার বা ওস্তাদ মঞ্চে এলো। তার পোশাকের বাহার দেখেই লোকজন হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। গায়ে সাদা কোট। কোমরে পড়েছে গলাবন্ধ আর জুতো জোড়া ঝুলিয়েছে গলায়। মাথায় টুপির বদলে

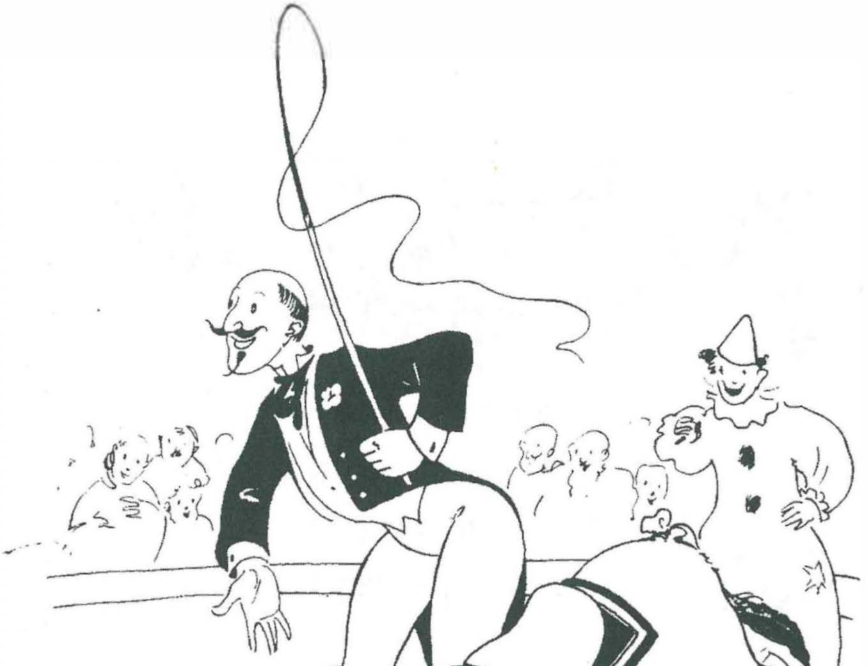

একটা ভাঙা হাঁড়ি। পিনোকিও-কেও নানা রঙের পোশাকে সাজানো হয়েছে। সার্কাসের গাধা বলে কথা। তাছাড়া আজকের প্রধান আকর্ষণ হলো এই গাধা-শিল্পী।

সার্কাস শুরু হয়ে গেল। পিনোকিও ওস্তাদের নির্দেশ মতো একের পর এক খেলা দেখাচ্ছে আর জনগণ হাসতে হাসতে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

প্রত্যেক পর্বেই পিনোকিও খুব সুনাম এবং হাতে তালি কুড়ালো। গাধার এই সাফল্যে ওস্তাদের আনন্দ আর ধরে না। পিনোকিও খেলতে খেলতে একবার দর্শকের দিকে তাকালো। এতো মানুষের ভিড়ে একটা সুন্দরী মেয়ের দিকে চোখ পড়লো তার। খুব চেনা মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো। একি! এ যে তার পরী-মা বসে আছে। সে 'পরী-মা' 'পরী-মা' বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু গলা দিয়ে গাধার ডাকের মতোই একটা বিশ্রী স্বর বের হলো। এতে সার্কাস দেখতে আসা ছেলেমেয়েরা খুব মজা পেলো এবং হিঁ-হি হাঁ-হা করে হাসতে লাগলো। তখন ওস্তাদ এসে গাধাকে আদর করার ছলে কানে কামড় বসিয়ে দিলো। অর্থাৎ, যা শিখিয়েছে তার বেশি কিছু করা যাবে না।

সার্কাসের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় আইটেম চাকার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে চলা। পিনোকিও-র সার্কাসে মন নেই। সে তার পরী-মাকে দেখেছে। পরী-মার কথা ভেবে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। সার্কাসের ওস্তাদ বলছে:

লাফ দাও বাবা গাধা-সোনা
চাকা যেন গায় লাগে না।

পিনোকিও অন্যমনস্ক হয়ে লাফ দিলো। চাকার ভেতর না গিয়ে চাকাসহ একেবারে মঞ্চের বাইরে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পিছনের একটা পা কিছুতেই সোজা করতে পারলো না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে সার্কাসের গাধাঘরের দিকে চলে গেল।

পরদিন গাধার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হলো। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলো। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো : কোনো আশা নেই। তার মানে এই খোঁড়া গাধার পা আর জোড়া লাগবে না।

মালিকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কতোদিন পরিশ্রম করে এই গাধাকে শিক্ষিত করেছে সে। তার আশা-ভরসা সব ধুলিসাৎ হয়ে গেল ওস্তাদ তার সহকারিকে বললো : ওকে গাধার হাটে নিয়ে বিক্রি করে দাও।

খোঁড়া গাধা কে কিনবে বলো? ওকে দিয়ে তো কোনো কাজই হবে না।

একজন লোকের ঢোল বানাবার জন্য গাধার চামড়ার দরকার ছিলো। সে নাম-মাত্র মূল্যে গাধাটাকে কিনে নিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে গেল। পিনোকিও ভয়ে চুপসে গেল। গা থেকে চামড়া খুলে নেবে?

সেই লোকটা পিনোকিও-র পায়ে বাইশ মন ওজনের একটা পাথর বেঁধে গলায় রশি ঝুলিয়ে সমুদ্রের গভীর পানিতে ফেলে দিয়ে খোঁড়া গাধার মরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন মরবে তখন গা থেকে চামড়া তুলে নেবে সে। তারপর ঢোল বানিয়ে মনের সুখে বাজাবে : তাক-ধুম তাক-ধুম, তাইরে নাইরে না।

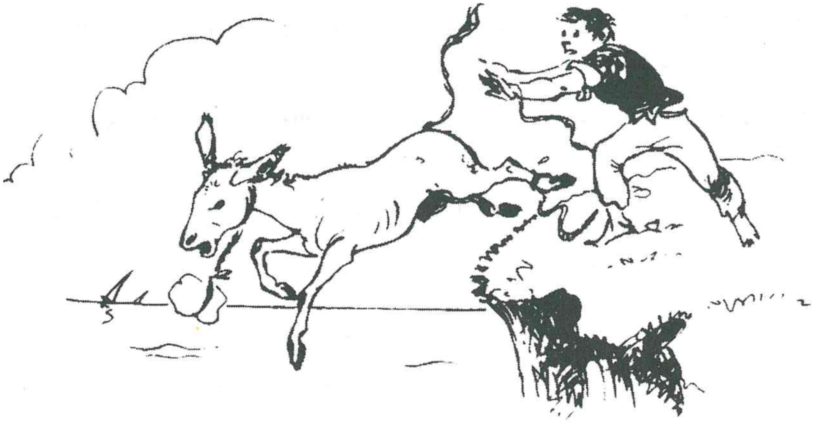

## চৌত্রিশ

*জলের নিচে গাধা আবার পুতুল হলো*
*একি কাণ্ড! খোঁড়া গাধা কই হারালো?*
*পিনোকিও যাচ্ছে জলে সাঁতার কেটে*
*অবশেষে প্রকাণ্ড এক মাছের পেটে।*

ঘণ্টাখানেক পানির নিচে ডুবিয়ে রাখার পর লোকটা খোঁড়া গাধাকে টেনে তুলতে লাগলো। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ওটা মরে শক্ত হয়ে গেছে। এবার চামড়াটা তুলেই সোজা বাড়ি চলে যাবে সে। দড়ি টানছে তো টানছেই। দড়ি যেন দ্রৌপদীর শাড়ি। কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে লোকটা জলের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আবার টানতে শুরু করলো। টানতে টানতে সে যখন বাইশ মন ওজনের পাথরসহ গাধাটাকে পানির ওপরে তুলল, তখন ভয়ে এবং বিস্ময়ে তার জিব এক হাত বাইরে চলে এসেছে। একি কাণ্ড? গাধাটা গেল কোথায়? গাধার জায়গায় এ কোন আজব জীব উঠে এসেছে। এ কে? জলের দেবতা-টেবতা নাকি?

লোকটার এই অবস্থা দেখে পিনোকিও-র খুব হাসি পেলো। মানুষকে বোকা বানানোর মজাই আলাদা! কিন্তু হাসি আড়াল করে সে কথা বলতে শুরু করলো:

*অবাক হবার কি আছে ভাই*
*আমিই সেই গাধা*
*এই দেখো আগের মতোই*
*রশি আছে বাঁধা।*

লোকটা ভাবলো, তার সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে। রাগ করে বললো :

–দেখো, ঠাট্টা করার সময় এটা নয়। চামড়ার জন্য আমি টাকা দিয়ে খোঁড়া গাধা কিনেছি। গাধার বদলে তুমি এলে কেনো? তোমার গায়ে তো দেখছি চামড়াই নেই। তোমাকে দিয়ে আমি কি করবো? আমি গাধা চাই।

পিনোকিও আবার ছড়া কাটতে শুরু করলো :

*রাগ করো না ঘটনাটা খুলে বলি শোনো*
*কাঠের পুতুল গাধা হয় দেখেছো কখনো?*
*পড়াশোনার ভয়ে আমি ইচ্ছেপুরী গেলাম*
*সেখান থেকে সার্কাসের গাধা হয়ে এলাম।*
*চাকার ভেতর লম্ফ দিয়ে পা ভেঙে গেলে*
*বাজার থেকে কিনে তাই তুমি নিয়ে এলে।*

লোকটা এসব ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। কি সব আজে বাজে বলছে পুতুলটা? ওর কথা তো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। খোঁড়া গাধা কিনে সে একটা গাধার কাজ করেছে। চামড়া তো পেলামই না, এখন আবার সাগর পাড়ে বসে পাগলের প্রলাপ শুনতে হচ্ছে।

পিনোকিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুললো না।

–অন্যভাবে না মেরে বা জীবন্ত আমার গা থেকে চামড়া না তুলে নিয়ে তুমি আমার অনেক বড়ো উপকার করেছো। পরী-মা বারবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আজ তুমি আমার জীবন বাঁচালে।

–তোমার গল্পের ভেতর আবার পরী-মা প্রবেশ করলো যে! এ আবার কেমনতর মা? মাসী-মা, পিসী-মা, ছোটো-মা বড়ো-মা শুনেছি, কিন্তু পরী-মা তো কোনোদিন শুনি নাই। একটু খুলে বলো।

পিনোকিও তার পরী-মার কথা বলতে শুরু করলো। সে গল্প তো সহজে শেষ হবার নয়। তার যে কোনো বিপদেই তো পরী-মা নানাভাবে নানা পরিচয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে। এই যেমন আজকের ঘটনা। পানির নিচে পরী-মার কারণেই তো সে আজ খোঁড়া গাধা থেকে পুতুল হয়ে ফিরে এলো:

লোকটা আশ্চার্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো :

–বড়োই তাজ্জব ব্যাপার। একটু খোলাসা করে বলো তো বাপু।

পিনোকিও-র কথার ভেতর সুর চলে এলো। বিশেষ করে পরী-মার কথা বলতে গেলে সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কথায় কবিতা চলে আসে :

*পরী-মা দেখলো ডুবে মরে যাবো*
*ভাবলো : বাঁচাতে মাছকে পাঠাবো*
*মাছেরা খেলো দেহ চামড়া ও গাল*
*ভেতরে ছিলো এই কাঠের কঙ্কাল*
*অতঃপর রশি ধরে তুমি দিলে টান*
*এইভাবে পুতুলের বেঁচে গেলো জান।*

এসব গাঁজাখোরি গল্পে লোকটা আরো বিরক্ত হলো। মেজাজের ভোল্টেজ বেড়ে গেল। চিৎকার করে বললো :

–এসব কথায় চিড়ে ভিজবে না। তুমি আমার চামড়া ফেলো।

–তোমার চামড়া তো তোমার গায়েই আছে। একটু কষ্ট করে তুলে নাও না!

–তবে রে হারামজাদা, দেখাচ্ছি মজা। তোকে জ্বালানি হিসেবে বাজারে বিক্রি করবো। সেই টাকায় চামড়া কিনবো।

বলেই সে কাঠের পুতুলকে ধরতে গেল। পুতুল এক লাফে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাঁতার কাটতে কাটতে বললো :

*টা টা বাই বাই*
*ঢোল নাই খোল্ নাই।*
*তাইরে নারে নারে*
*বাড়ি ফিরে যা রে।*

পিনোকিও আপন মনে সাঁতার কেটে কেটে চলছে। কি বিশাল সাগর। এই সাগরেই তো সে তার বাবাকে হারিয়েছে। কে জানে তার বাবা আজ কোথায়

আছে, কেমন আছে। যেমন করেই হোক বাবাকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। খুঁজে পেতে হবে তার পরী-মাকে। এইসব ভাবতে ভাবতে সে ভেসে চলছে। হঠাৎ চোখে পড়লো সাগরের মধ্যে একটা দ্বীপের মতো। সাদা ধবধবে দ্বীপ যেন। এই দ্বীপের নাম হয়তো ধবল দ্বীপ। কে জানে দুগ্ধদ্বীপও হতে পারে। সেই দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে কে যেন পিনোকিও-কে হাত নেড়ে নেড়ে

কাছে ডাকছে। একটা ছায়ামূর্তির মতো দেখতে। তবু কেনো যেন পিনোকিও-র মনে পড়লো পরী-মার কথা। তার মতো এমন মানবী ত্রিভুবনে আর কে আছে? পরী-মার কথা ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা নড়েচড়ে উঠলো। কিন্তু একি কাণ্ড? সেই ধবল দ্বীপ বা দুগ্ধদ্বীপ যে কাঁপতে শুরু করেছে? একটা ঝড় উঠলো যেন। সেই ঝড়ে দ্বীপের ওপরে দাঁড়ানো ছায়ামানবীর চুলগুলো সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এমন সময় পিনোকিও লক্ষ করলো, দৈত্যের মতো বিশাল একটা মাথা সাগরের পানিতে ভেসে উঠলো। মাথা তো নয় যেন এও একটা দ্বীপ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে পিনোকিও প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। চোখ দুটো বিশাল আগুনের গোলা। হাঁ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলো ভেতরে কম করে হলেও চৌদ্দ পাটি দাঁত। সেই আজব জীবটি কিন্তু পিনোকিও-র দিকেই এগিয়ে আসছে।

বন্ধুরা, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সাগরের বিশাল মাছের গল্প আমরা শুনেছি। এই মাছের অত্যাচারে সাগরের সব মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

পিনোকিও প্রাণপণ সাঁতার কেটে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই মাছের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। সেই ছায়ামূর্তি তার চুলগুলো পিনোকিও-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছে :

–পিনোকিও তাড়াতাড়ি আমার চুল ধরার চেষ্টা করো। ওই রাক্ষুসে মাছ তোমাকে গিলে ফেলবে।

কিন্তু পিনোকিও ধরি ধরি করেও সেই ছায়ামূর্তির চুল ধরতে পারলো না। সেই বিশাল মাছের হাঁ-এর ভেতর ঢুকে গেল সে।

প্রথম ধাক্কায় পিনোকিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। যখন জ্ঞান ফিরল তখন অনুভব করলো, সে একটি অন্ধকার গুহার ভেতরে আছে। জায়গাটা বড়ো হলেও ভেতরের বাতাসটা তেমন সুবিধের নয়। বেশ গরম এবং একটা বিশ্রী গন্ধযুক্ত বাতাস। পিনোকিও সেই মাছের ফুসফুসের কাছে চলে গেছে।

পিনোকিও ভাবলো, এই বিপদের সময় সাহস হারালে চলবে না। জীবনে অনেক বিপদ এসেছে এবং ঘটনাক্রমে সেইসব বিপদ থেকে রক্ষাও পেয়েছে। প্রথমে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলেও পরে ভাবলো : দেখা যাক কি হয়।

মাছের পেটের ভেতর পায়চারি করছে আর আপন মনে কথা বলছে পিনোকিও। মাঝে মাঝে গানও গাইছে। কারণ গান গাইলে নাকি মনে সাহস আসে। ভেতরে ভয় ঢুকতে পারে না। সে গুনগুন করছে :

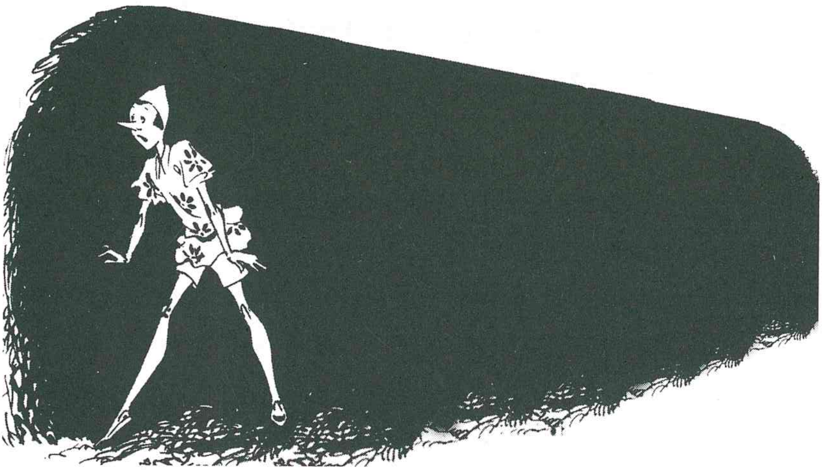

*আমি ভাই মাছের পেটে*
*একাকী বেড়াই হেঁটে।*
*আঁশটে এই গন্ধ ঘেটে*
*মরে যাবো বুক ফেটে?*

গান শুনে একটা মাছ এসে তার পাশে দাঁড়ালো। তোমাদের বলা হয় নি যে, পিনোকিও-র সঙ্গে এই বিশাল মাছের হাঁ-এর ভেতর কয়েক হাজার মাছও প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্য থেকেই একজন এসে জিজ্ঞেস করলো :

–কি হে মৎস্যভাই? মাছের পেটের ভেতর বসেও তুমি গান গাইছো?

–তা গাইছি। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি চিতল ভাইয়া, আমি মাছ নই। আমার নাম পিনোকিও।

–তা, তুমি যাই হও। এবার বলো, কি ঠিক করলে? আমার মতোই তো শেষ পর্যন্ত মাছের পেটেই হজম হচ্ছো, নাকি?

–আমি অতো সহজে মরতে চাই না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তির চেষ্টা করবো।

এমন সময় বেশ দূরে একটু আলোর মতো চোখে পড়লো। পিনোকিও-র মনে আশার সঞ্চার হলো। আলো মানেই তো আশা। উপায়। মুক্তির উপায়। পিনোকিও জিজ্ঞেস করলো :

–ঐ দূরে একটু আলো দেখা যাচ্ছে না চিতল ভাইয়া?

–হ্যা তাইতো। আমাদের মতোই কোনো হতভাগা হবে।

–আমি একটু খোঁজ নিয়ে আসি। বলা তো যায় না, মুক্তির একটা পথ হয়তো মিলতে পারে।

–তোমার মঙ্গল হোক পুতুল ভাই। আমাদের হয়তো আবার দেখা হবে।

–হয়তো হবে। হয়তো হবে না। কিন্তু আমাদের এই পরিচয়টুকু অক্ষয় হয়ে থাক।

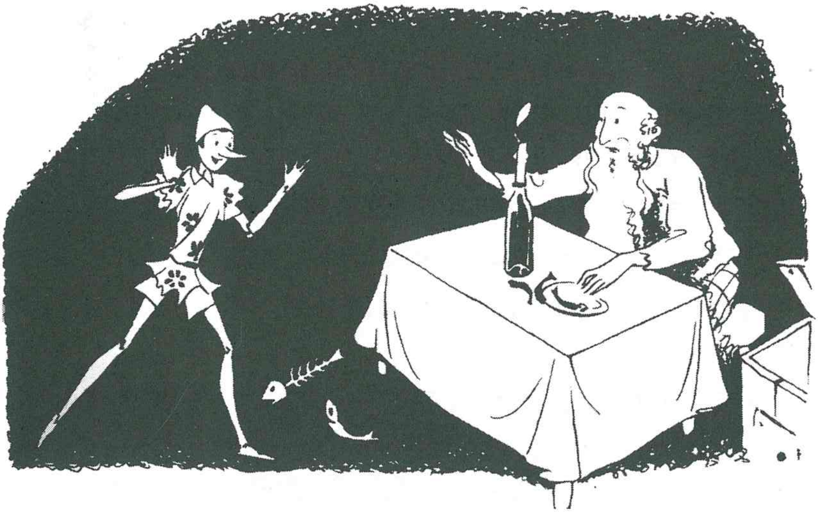

## পঁয়ত্রিশ

*পিনোকিও আলোর কাছে গেলো*
*এক বুড়োকে দেখে অবাক হলো।*
*কে এই বুড়ো? বলবো ধীরে ধীরে*
*কাঠের পুতুল বাপকে পাবে ফিরে?*

সেই রাক্ষুসে মাছের পেটের ভেতর পিনোকিও হাঁটছে তো হাঁটছেই। এ যে অনেক দূরের আলো। কিন্তু যতো দূরেই হোক তাকে পৌছাতেই হবে। হাঁটতে মন্দ লাগছে না, শুধু অন্ধকারে উচু নিচু পথে মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে এবং সেই বিশ্রী ও বীভৎস গন্ধটা নাকে এসে লাগছে এই যা।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক হেঁটে অবশেষে সেই আলোর কাছে গিয়ে পৌঁছালো। দেখলো, একজন বৃদ্ধ হাজারখানেক জোনাক পোকা জড়ো করে চমৎকার একটা আলোর ঘর তৈরি করে বিষণ্ন মনে বসে আছে। চুলে-গোঁফে-দাঁড়িতে অবস্থা এমন যে ভালো করে মুখটা দেখার উপায় নেই। অনেকদিন সূর্যের আলো দেখে নি। তাই গায়ের রং একেবারে ধবধবে ফর্সা বা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে। জোনাক পোকা দেখে টেংড়া পুটি বাতাসি কই খলশে শিং মাগুর রয়না টাকি ইত্যাদি ছোটো মাছ সেই দিকে ছুটে আসছে আর বৃদ্ধ লোকটা খপ্ করে ধরে ধরে খাচ্ছে। রুই কাতল চিতল বোয়াল শৈল গজার ইত্যাদি বড়ো

মাছগুলোকে সে লাথি মেরে বিদায় করে দিচ্ছে। কারণ, কাটাকাটির ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না। বড়ো মাছকে তো আর একবারে মুখে পুরে দেয়া যায় না।

পিনোকিও কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো :

–আপনার মঙ্গল হোক। এবং এই ছোটো মাছ খেয়ে আপনার চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পাক।

–তোমার ও মঙ্গল হোক বাবা।

এই কথা শুনে পিনোকিও-র মাথাটা কেমন যেন করে উঠলো। কে এই বুড়ো? খুব চেনা কণ্ঠস্বর। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ি গোঁফ সরিয়ে বৃদ্ধের চেহারা দেখার চেষ্টা করলো। একি কাণ্ড? এ যে তার বুড়ো বাবা বোতল মিয়া! 'ওরে বাবারে' বলেই সে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরলো। বুড়োরও একই রকম প্রতিক্রিয়া হলো। দুজন দুজনের গলা ধরে জাড়াজড়ি কান্নাকাটি করলো কিছুক্ষণ। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ বললো :

–ওরে আমার পুতুল সোনা। তুমি বেঁচে আছো পিনোকিও? তোমার খোঁজে এসেই তো আজ আমি এই মাছের পেটে। তোমার মুখটা দেখবার জন্য এখনো বেঁচে আছি বাবা। ওরে আমার সোনামানিক, ওরে আমার বুকের ধন, ওরে আমার হাতের লাঠি, ওরে আমার চোখের মণি...

–আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন বাবা। আপনার কথা না শুনেই আজ আমার এই দশা। আপনি আমার লক্ষ্মি বাবা। এমন বাবা সারা দুনিয়ায় আর একটিও নেই। আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি বাবা।

বলেই আবার বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

–আমি যে তোমার বাবা। বাবা কি তার সন্তানকে ক্ষমা না করে পারে? কিন্তু তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে বাবা? আর এখানে এলেই বা কি করে?

তারপর পিনোকিও একে একে সব ঘটনা বোতল মিয়াকে খুলে বললো। বাবার গায়ের একমাত্র কোট বিক্রি করে বর্ণমালা কেনা, স্কুলে যাওয়ার বদলে পুতুল খেলা দেখতে যাওয়া, পুতুল মাস্টার মুটোর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে সোনার মোহর নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভণ্ড নেকড়ে বাঘ ও অন্ধ বিড়ালের হাতে পড়া, গুণ্ডাদের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে পরীর রানীর কাছে যাওয়া, সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবার নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালের দুষ্টু বুদ্ধিতে ধনকুবেরের দেশে গিয়ে সোনার মোহর হারানো, বানরের দেশে গিয়ে কারাবরণ, সেখান থেকে

আবার পরী-মার কাছে যাওয়া এবং পড়াশোনা শুরু করা, দুষ্টু বন্ধু পটকার পরামর্শে খেলাধুলার দেশে গিয়ে গাধা হয়ে সার্কাসের মালিকের আশ্রয়ে নানা রকম ক্রীড়াকৌশল শেখা ও খেলা দেখাতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে বাজারে বিক্রি হওয়া, জলের নিচে গিয়ে পরী-মার সাহায্যে আবার পুতুল হয়ে যাওয়া এবং সাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে রাক্ষুসে মাছের পেটের ভেতরে আসা ইত্যাদি কোনো কিছুই বাদ দিলো না।

বোতল মিয়া মিয়া সব কথা শুনে হায় হায় করে উঠলো।

–তুমি অনেক কষ্ট করেছো পুতুল সোনা। আজ আমার কি যে ভালো লাগছে! আমি আমার বুকের মানিককে আবার ফিরে পেয়েছি।

–কিন্তু আপনি কেমন করে এতোদিন এই মাছের পেটে বেঁচে রইলেন বাবা?

–সে অনেক কথা। কষ্ট করেই বেঁচে আছি। কতোদিন সূর্যের মুখ দেখি না। তবে খাবার-দাবারের কোনো কষ্ট হয় নি। নিয়মিত তরতাজা মাছ খাচ্ছি। এই মাছে ফরমালিন নেই বলে কোনো অসুখ বিসুখও হয় নি। এছাড়া মাঝে মাঝেই তো সাগরে লঞ্চ ডুবে। সেই লঞ্চগুলো এই রাক্ষুসে মাছ গিলে ফেলে। সেই লঞ্চে কতোকিছু থাকে! চাল-ডাল-রুটি-বিস্কুট-ঘি-পিঁয়াজ-মরিচ-মধু-চিনি আরো কতো কি? মাঝে মাঝে মোমবাতি এবং দিয়াশলাইয়ের লঞ্চও ডুবে যায়। সেগুলো দিয়েই দিনকাল বেশ চলে যাচ্ছিলো।

–এখানে আর এক মুহূর্তও নয় বাবা। আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

–সেটা কি করে সম্ভব?

–এই রাক্ষুসে মাছ যখন হাঁ করে ঘুমাবে তখন আমরা সাঁতার দিয়ে সেই হাঁ-মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবো।

–কিন্তু আমি তো সাঁতার জানি না।

–সেজন্য কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি আমার পিঠে শক্ত করে বসবেন। আর আমি সাঁতরে সাগরের তীরে পৌঁছে যাবো। আমার পিঠে বসতে আপনার কষ্ট হবে না তো?

–তা তো একটু হবেই। যে শক্ত শরীর তোমার। পিঠের দিকটাই আরো বেশি শক্ত। কিন্তু উপায় নেই। বাঁচার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। মরতে হলে বাপ-বেটা একসঙ্গে মরবো।

–আর দেরি করা ঠিক হবে না। চলুন আমরা এই রাক্ষুসে মাছের মুখের দিকে এগুতে থাকি।

মজার ব্যাপার হলো এই মাছটা যখন ঘুমাতো তখন মুখটা হাঁ হয়ে খুলে থাকতো। হাঁপানির অসুখ ছিলো হয়তো। ওরা সিদ্ধান্ত- নিলো, এই হাঁপানি বা হাঁ-এর সুযোগকেই কাজে লাগাতে হবে।

অতঃপর তারা মাছের মুখের দিকে হাঁটতে শরু করলো। ভেতরটা ছিলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই অন্ধের মতো লাঠি ঠুকে ঠুকে তারা হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে একটা পিচ্ছিল পথে এসে উঠলো তারা। বুঝতে পারলো এটা মাছের জিভ। জিভের ওপর দিয়ে চুপি চুপি চলতে চলতে একেবারে মুখের কাছে চলে এলো। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মতো জিভটা অতিক্রম করে তাঁরা এসে পৌঁছালো দাঁতের পাটির কাছে। তারপর একটার পর একটা দাঁতের পাটি পার হয়ে গেল তারা।

তারা চলে এসেছে একেবারে মুখের কাছে, মানে হাঁ-এর কাছে। এবার বোতল মিয়া জানতে চাইলো :

—এখন কি হবে পুতুল সোনা?

—আপনি আমার পিঠের ওপর শক্ত করে বসুন।

—যদি পড়ে যাই?

—তাহলে আপনার লম্বা চুল কিংবা গোঁফ দিয়ে নিজেকে আমার সাথে শক্ত করে বেঁধে নিন।

বোতল মিয়া তাই করলো। গোঁফের দুই দিক পিনোকিও-র পেটের দুই দিকে দিয়ে শক্ত গিঁট দিলো। তারপর সুযোগ বুঝে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পিনোকিও সাঁতার কাটতে শুরু করলো।

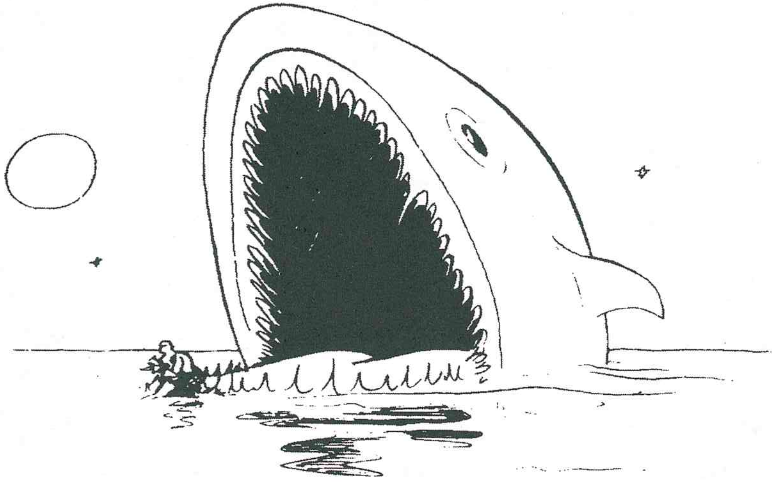

সেই রাক্ষুসে মাছ তখনো নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। পিনোকিও একবার পিছনে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো সেই মাছকে। মনের আনন্দে একটু গানও গাইলো সে :

*রাক্ষুসে মাছ ওরে গাধা*
*আমি বাবার গোঁফে বাঁধা।*
*ফিরে যাবো নিজের ঘরে*
*বাঁচবো আবার নতুন করে।*

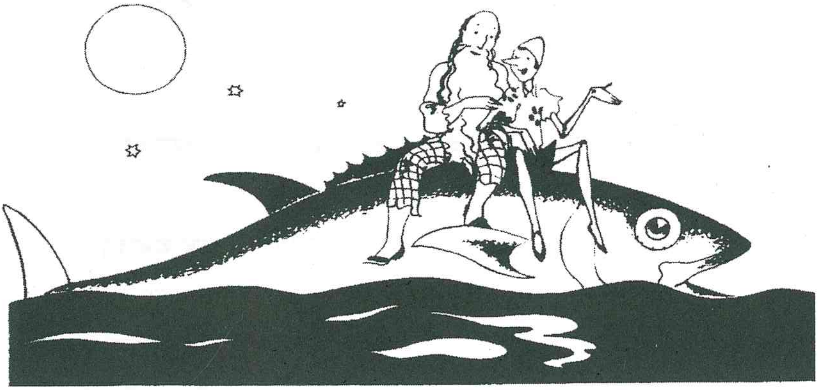

## ছত্রিশ

*চোখের জলে নানা ছলে*
*ঘুরে দেশে দেশে।*
*কাঠের পুতুল পিনোকিও*
*মানুষ হলো শেষে*

সাঁতার কেটে কেটে ঝড়ের বেগে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পিনোকিও। পিঠের ওপর বসে আছে তার বাবা বোতল মিয়া। কিন্তু এই সাগরের যেন কূল নাই কিনার নাই। বোতল মিয়া ভয়ে এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললো :

–তীর আর কতো দূরে পিনোকিও? আমি যে আর পারছি না।

–আরেকটু ধৈর্য্য ধরুন বাবা। যেভাবেই হোক তীরে পৌঁছাতেই হবে। আপনি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকুন।

কিন্তু শক্ত করে কিভাবে ধরবে! তার হাতের আঙুলগুলোই যে শক্ত হয়ে গেছে। সাগরের এই লোনা পানিতে কদিনই বা ভেসে থাকা যায় বলো? যেদিকেই তাকায় কেবল পানি আর পানি। চোখে ঘুম নাই দেহে বল নাই। শীতে এবং ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো বোতল মিয়া। পিনোকিও 'বাবা' 'বাবা' বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু বাবা কোনো সাড়া দিলো না। অবস্থা বেগতিক

দেখে ‘বাঁচাও বাঁচাও আমরা ডুবে যাচ্ছি’ বলে হাত নেড়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই সাগরের মধ্যে কে তাদের বাঁচাতে আসবে বলো? এমন সময় পানির ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো :

–কে ডুবে যাচ্ছে?

–আমি আর আমার বুড়ো বাপ। আমার বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

–বলো কি! এ তো বড়ো বিপদের কথা।

কণ্ঠস্বর খুব চেনা মনে হচ্ছিলো পিনোকিও-র। তাই জিজ্ঞেস করলো :

–কে তুমি ভাই? কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

হ্যা বন্ধু। আমি সেই চিতল মাছ। রাক্ষুসে মাছের পেটেই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। তোমাদের দেখানো পথেই তো আমি ওই মাছের কারাগার থেকে বেরিয়ে এলাম।

–এবার আমাদের একটু সাহায্য করো ভাই।

–তোমরা আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছো। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তোমাদের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে আমার পিঠে উঠে বসো। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাদের সাগরের তীরে পৌঁছে দেবো।

পিনোকিও সময় নষ্ট না করে বোতল মিয়াকে নিয়ে চিতল মাছের পিঠের ওপর বসে পড়লো। পিনোকিও আর বোতল মিয়াকে নিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চললো চিতল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাগরের পাড়ে পৌঁছে গেল তারা। পিনোকিও কৃতজ্ঞতায় চিতল বন্ধুর কপালে কয়েকটি চুমু দিয়ে বললো :

–তুমি আমাদের বিরাট উপকার করলে ভাই। তুমি সত্যিকারের বন্ধুর মতোই আমাদের বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছো।

চিতল কিছু না বলে শুধু একটু হাসলো। তারপরই সাগরের জলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিনোকিও ও বোতল মিয়া যখন তীরে পৌঁছালো তখন দুপুর। বোতল মিয়া কতোদিন পর আজ সূর্যের মুখ দেখলো। দাড়ি-গোঁফে আঙুল বোলাতে বোলাতে পিনোকিও-কে বললো :

–তোমার ঐ চিতল বন্ধুর জন্যই আজ আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম।

–তা ঠিক। কিন্তু কিছু খাবারের ব্যবস্থা না করলে তো বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

–আমার অবস্থা তো আরো খারাপ বাবা। বুঝো-ই তো, বয়স হয়েছে। এখন আর শরীরে তেমন বল নেই। চলো আগে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করি। আশ্রয় পেলে খাবারও নিশ্চয়ই জুটবে।

অতঃপর তারা একটা গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। গ্রামের পথেই পিনোকিও দেখলো, সেই ভণ্ড নেকড়ে বাঘ ও অন্ধ বিড়াল ভিক্ষা করতে বের হয়েছে। নেকড়ে বাঘের লেজ নেই। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলো। তাই লেজ কেটে দিয়েছে। আর বিড়াল চোখ বন্ধ করে থাকতে থাকতে সত্যি সত্যিই অন্ধ হয়ে গিয়েছে। পিনোকিও-কে দেখেই তারা দুই হাত বাড়িয়ে বললো :

–আমরা আজ খুব গরিব। কতোদিন কিছু খাই না। আমাদের কিছু ভিক্ষা দাও বাবা।

পিনোকিও ভিক্ষা দিলো না। আসলে দেয়ার মতো কিছু ছিলোই না। শুধু বললো:

–এতো দিন মানুষকে ঠকিয়ে আরাম আয়েশে জীবন কাটিয়েছ। আজ পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করতে বের হয়েছো। এটা তোমাদের পাপের শাস্তি। তোমাদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে পিনোকিও তার বাবার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

যেতে যেতে একটা ঘর চোখে পড়লো। পিনোকিও এবং বোতল মিয়া সেই ঘরের কাছে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো। অনেকক্ষণ পর দরোজা খুলে গেল কিন্তু ঘরে কাউকে দেখা গেল না। তারা ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। কিন্তু কেউ নেই। হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ পড়ায় দেখলো সেই ঝিঁ-ঝিঁ পোকা।

পিনোকিও কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো :

–আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার সেই অপরাধের শাস্তিও আমি পেয়েছি।

–তুমি যদি তোমার ভুল বুঝে থাকো তাতেই আমি খুশি। আমি তোমাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। ছোটো হোক বড়ো হোক সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়।

–আমার শিক্ষা হয়েছে ভাই।

ঝিঁঝিঁ পোকার ঘরটা খুব পছন্দ হলো পিনোকিও-র। বললো :

–তোমার ঘরটা কিন্তু চমৎকার ঝিঁ-ঝিঁ ভাই।

–এই ঘরের মালিক তো আমি নই ভাই। গতকাল একটা সাদা রঙের গাভী এসে এই ঘরটা আমাকে দান করে গেছে।

–বলো কি ঝিঁঝিঁ ভাই! সেই গাভী এখন কোথায়?

–চলে গেছে। যাবার সময় তোমার কথা ভেবে অনেক কান্নাকাটি করলো। চোখের জল মুছতে মুছতে বললো : আমার পিনোকিও-কে বুঝি আমি আর কোনো দিনই দেখতে পাবো না।

–তাহলে তো সাদা গাভীর বেশে আমার পরী-মা এসেছিলো।

বলেই 'পরী-মা' 'পরী-মা' বলে পিনোকিও কান্নাকাটি শুরু করে দিলো :

–পরী-মাগো আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে পরী-মা। তুমি একবার এসে তোমার পুতুল সোনাকে দেখে যাও।

অনেক কান্নাকাটি এবং আহাজারির পর বোতল মিয়াকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঘরে একটা চটের ওপর বসিয়ে বললো :

–আমার বাবার জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। এক গেলাস দুধ হলে ভালো হয়। দুধ কোথায় পাই বলো তো?

–পাশের গ্রামেই একজন কৃষক আছে। তুমি তার কাছে গিয়ে চেষ্টা করতে পারো।

পিনোকিও এক দৌড়ে সেই কৃষকের বাড়ি চলে গেল। গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে এক গেলাস দুধ চাইলো। কিন্তু টাকা ছাড়া দুধ দিতে সে রাজি হলো না। কিন্তু পিনোকিও-র হাতে তো একটা কানাকড়িও নেই। অবশেষে কৃষকের সবজি বাগানে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা লাঙল টানল সে। কৃষক বললো :

–আমার গাধাটা বার্ধক্যজনিত নানা জটিল রোগে আক্রান্ত। তাই গাধার কাজটা তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিলাম। তাছাড়া তোমার তো জানার কথা, পরিশ্রম ছাড়া কোনো কিছুই আশা করা অন্যায় এবং অনুচিত। গাধার কথা বলতেই তার অতীত জীবনের কথা, মানে গাধা জীবনের কথা মনে পড়ে গেল।

ভাবলো, বেচারা গাধাটাকে একনজর দেখে যাই। তারপর কৃষককে বললো :

–আপনার গাধাটা আমি একটু দেখতে পারি।

–কেন নয়? ঐ তো গাধার ঘরেই অথর্বটা শুয়ে আছে।

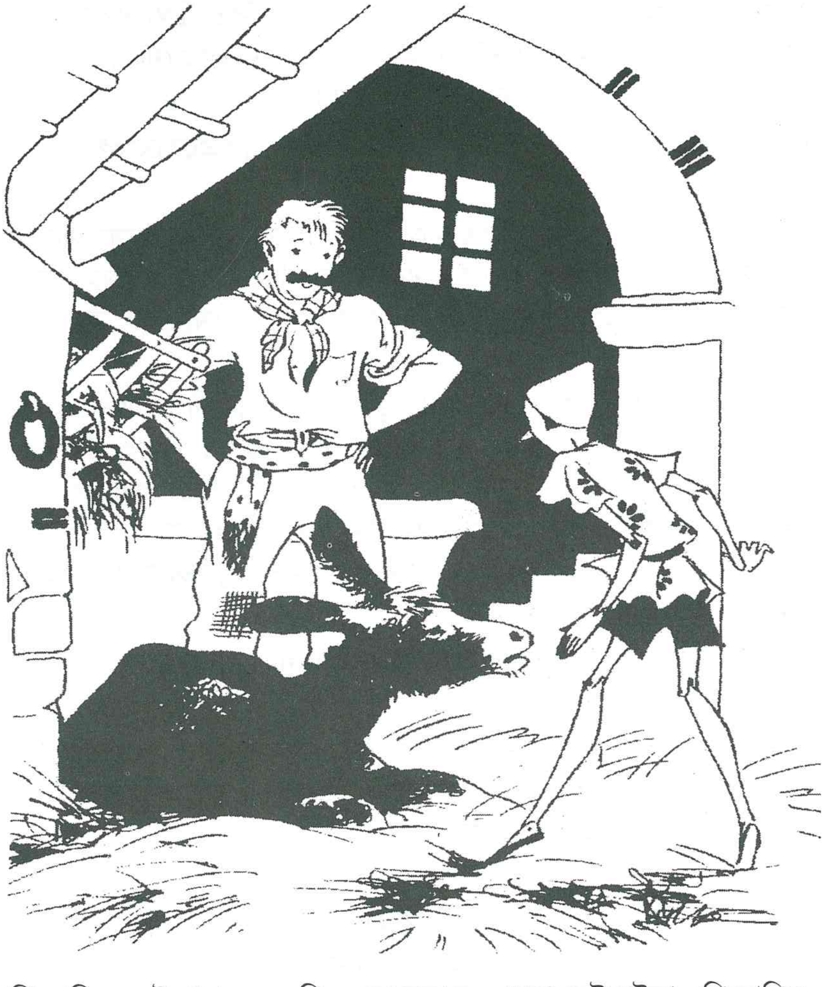

পিনোকিও সেই গাধার ঘরে গিয়ে তো অবাক। এতো সেই পটকা। পিনোকিও-র এক সময়ের বন্ধু। ওকে দেখেই গাধাটা হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো। তারপর চোখ বন্ধ করে মাথাটা নিচের দিকে নামালো।

পিনোকিও সেই কৃষককে বললো।

–এই গাধা আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু।

–তাহলে তো তুমিও একটা আস্ত গাধা।

বলেই কৃষক হো হো করে হাসতে লাগলো। পিনোকিও চিন্তা করলো, ওর জীবনে ঘটে যাওয়া গল্পগুলো এই কৃষককে বলে কোনো লাভ নেই। তাই কথা না বাড়িয়ে দুধের গেলাস নিয়ে বাড়ি চলে এলো।

এভাবেই প্রতিদিন ঐ কৃষকের বাড়ি গাধার কাজ করে দুধ এনে বোতল মিয়াকে খাওয়াতে লাগলো।

পিনোকিও আরো কিছু কাজ শিখে নিলো। দিনের বেলা কিছু সময়ের জন্য ঐ কৃষকের জমিতে চাষ করে। বাকি সময়টায় কাঠ দিয়ে নানা রকমের খেলনা তৈরি করতে লাগলো। খেলনা বিক্রি করে দুজনের মোটামুটি দিন চলে যাচ্ছিলো।

এই কাজের মধ্যেও সে নিজের লেখাপড়াটা চালিয়ে নিলো। কাগজ কেনার মতো টাকা তো হাতে থাকে না। তাই গাছের পাতার ওপরে লেখার চর্চা করে। হাঁড়ির নিচের কালি সাথে পানি মিশিয়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলমের কাজ চালালো। সবকিছুর খরচ চালিয়ে কিছু টাকা জমা করলো সে। বাবার জন্য একটা কোট কিনবে। তাছাড়া নিজের জন্যও দরকারি কিছু জিনিস যেমন টুপি, জামা, জুতো ইত্যাদি কিনতে হবে।

একদিন বাবাকে বলে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলো। বাবার জন্য কেনাকাটা করবে। হাঁটতে হাটঁতে ভাবতে লাগলো :

–কোট পেয়ে বাবা কি যে খুশি হবে। বাবার জন্য কিছু করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। রাত জেগে কাজ করছি। সংসারের খরচ চালিয়ে দুপয়সা জমাও করছি। ভালোই আছি আমরা :

*লাঙল চালাই খেলনা বানাই*
*বিক্রি করি হাটে।*
*আমার এবং বুড়ো বাবার*
*সুখেই দিন কাটে।*

এইসব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে, এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়ালো একটি চিল। পিনোকিও দেখেই চিনতে পারলো এটা তার পরী-মার চিল। এই চিলই

তাকে আমগাছের ঝুলন্ত অবস্থা থেকে পরী-মার কাছে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু চিলকে খুব অসহায় এবং বিপন্ন মনে হলো। তাকে এই অবস্থায় দেখে পিনোকিও তো অবাক!

–কি খবর চিল ভাই, তুমি এখানে? আমার পরী-মা কেমন আছে? সে এখন কোথায় ? আমার কথা কি তার মনে আছে? আমাকে মাফ করেছে তো?

–খবর ভালো নয় পুতুল ভাই। তোমার পরী-মা অসুস্থ। সে এখন হাসপাতালে। সে এখন গরীব হয়ে গেছে। অভাবে পড়ে ঠিকমতো খেতে পায় না।

–বলো কি চিল ভাই! আমার পরী-মা ঠিকমতো খেতে পায় না? অসুস্থ হয়ে সে এখন হাসপাতালে? আমার এখানে নব্বইটি টাকা আছে। এই টাকা কয়টি নিয়ে এক্ষুণি পরী-মাকে দাও।

–কিন্তু তুমি তো ভাই বাজারে যাচ্ছিলে? তোমার কেনাকাটা?

–সে কথা থাক ভাই। আমার পরী-মার জন্য গায়ের চামড়া কেটে জুতো বানিয়ে দিলেও তার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। আমার কাছে যদি নব্বই হাজার টাকা থাকতো, তাও আমি পরী-মার চিকিৎসার জন্য দিয়ে দিতাম। দুদিন পরে আবার এসো। আমি আরো কিছু টাকা জোগাড় করে পরী-মার জন্য পাঠাবো। আমি আগের চেয়ে আরো বেশি পরিশ্রম করবো। যাতে আমার পরী-মাকে অনাহারে থাকতে না হয়। সেই চিল তখন পিনোকিও-কে ধন্যবাদ জানিয়ে ফুরুত করে উড়ে চলে গেল।

কেনাকাটা না করেই পিনোকিও সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরো এলো। বোতল মিয়াকে বললো :

–আজ হাটে যাই নি বাবা। অন্যদিন গিয়ে আপনার জন্য কোট এবং আমার জন্য জামা, জুতো, টুপি কিনে আনবো।

–ঠিক আছে বাবা।

পিনোকিও রাতদিন পরিশ্রম করতে লাগলো। কাঠের খেলনার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নানা কাজে ব্যবহারের জন্য টুকিটাকি জিনিস যেমন টুল, পিঁড়ি, কলমদানি, ফুলদানি, মসলাদানি ইত্যাদি তৈরি করতে শুরু করলো। একদিন কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে ঘুমোতে গেল সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরী-মাকে স্বপ্ন দেখলো। পরীর রানী তাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। কপালে গালে চুমু খাচ্ছে আর বলছে :

*ওগো আমার পুতুল সোনা*
*সকল কাজের কাজী,*
*বুড়ো বাবার সুখের জন্য*
*জীবন রাখে বাজি।*
*আমার বুকে আদর স্নেহ*
*সোহাগ আছে জমা,*
*তাইতো তোমার ভুলগুলো*
*করে দিলাম ক্ষমা।*
*নিজের দোষে এক জীবনে*
*অনেক সাজা পেলে,*
*শাস্তি ভোগের শেষে আজ*
*মানুষ হয়ে গেলে।*

স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ধর্‌মর্‌ করে উঠে বসলো পিনোকিও। তারপর চারপাশে পরী-মাকে খুঁজতে লাগলো। যেন সত্যি সত্যি পরী-মা তার পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে চোখ গেল তার। একি কাণ্ড! তার হাত যে আর আগের মতো নেই! তারপর নাক, চোখ, মাথা, পা সবকিছু পরখ করলো সে। সবই যে বদলে গেছে! সে যে আর কাঠের পুতুলটি নেই। পিনোকিও সত্যি সত্যি আর দশটা ছেলের মতোই মানুষ হয়ে গেছে! স্বপ্ন কখনো এরকম সত্যি হয়?

তারপর সে ঘরের চারদিকে তাকালো। কিছুই আর আগের মতো নেই। ঘরের দেয়াল, মেঝে, খাট, আসবাবপত্র সব বদলে গেছে। একটি সুন্দর সাজানো, পরিপূর্ণ ঘরের চমৎকার খাটে বসে আছে সে। বারবার সে তার চোখ রগড়াতে লাগলো। না, সে যা দেখছে তা স্বপ্ন নয়, সত্যি।

একটি শালকাঠের আলনায় নানা রকম কাপড়চোপড় সাজানো। আলনার একপাশে টুপি রাখার চমৎকার ব্যবস্থা। নানা রঙের টুপি সেখানে ঝুলছে। আলনার পাশেই একটা জুতোর বাক্স। বাক্সের সামনের দিকটায় কাচ থাকায় ভেতরের জুতোগুলো দেখা যাচ্ছে।

যে বালিশটায় মাথা রেখে সে ঘুমিয়েছিলো সেটিও বদলে গেছে। বালিশ সরাতেই একটা মানিব্যাগ বের হলো। তাতে লেখা আছে :

*পরী-মাকে করেছিলে*
*যতো টাকা দান,*
*ম্যানিব্যাগে মোহর আছে*
*সেই পরিমাণ।*

অর্থাৎ, মানিব্যাগে নব্বইটি সোনার মোহর রয়েছে। ঘরের একপাশে পিনোকিও-র নিজের সমান লম্বা একটা আয়না রাখা আছে।

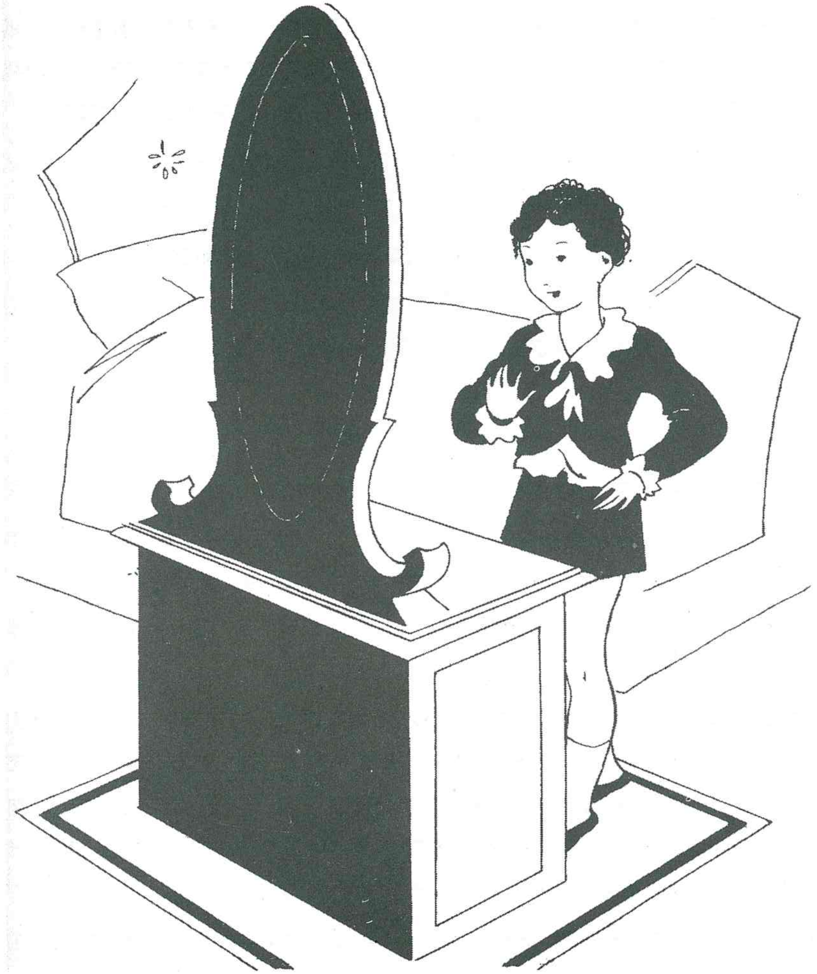

সেখানে গিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। নিজেকে সে চিনতেই পারছে না। এলোমেলো চুলগুলো চিরুনি দিয়ে ঠিক করতে করতে সে গুনগুন করলো:

*আমি এখন সুখি ফর্সা*
*জীবন্ত আর বুদ্ধিমান,*
*যা হয়েছি যা পেয়েছি*
*পরী-মায়ের অবদান।*

আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে পিনোকিও 'বাবা' 'বাবা' বলে চিৎকার করতে করতে পাশের ঘরে গেল। সেখানে বোতল মিয়া কাঠের গায়ে নানারকম আল্পনা তৈরি করছিলো। দামি খাটের গায়ে বা ছবির ফ্রেমে যে রকম আল্পনা থাকে। বোতল মিয়া ঠিক সেই আগের মতোই দেখতে। জেদি, মোটা, সুখি এবং স্নেহময়।

পিনোকিও এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বললো :

–আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। এসব কেমন করে হলো?

বোতল মিয়া পিনোকিও-র পরিপাটি করা চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে অত্যন্ত আদুরে গলায় বললো :

*কারণ কি আর অন্য?*
*সবই তোমার জন্য।*

তারপর আদর করে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বললো :

–অবাধ্য, দুষ্টু, দুরন্ত ছেলেরা যখন ভালো হয়ে যায়, তখন সবকিছুর মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসে। তার পরিবারের সবাই যেন নতুন জীবন লাভ করে। সবার মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। সেই ঢেউ, সেই আনন্দ নতুন জন্মের আনন্দ।

বোতল মিয়া যেখানে বসে কাজ করছে সেখান থেকে হাত দশেক দূরে একটা চেয়ারের ওপর চমৎকার সুন্দর একটা পুতুল বসে আছে। হাত দুটো কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে রাখা! যেন ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। একটা পা তুলে দিয়েছে আরেকটা পায়ের ওপর। ঘাড়টা সামান্য বাঁকিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। যেন ভাবছে। কী ভাবছে এই কাঠের পুতুল?

পিনোকিও অবাক বিস্ময়ে সেই পুতুলটার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে কি এখন

আর এইভাবে এই অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে থাকতে পারবে? অসম্ভব।

পিনোকিও মনে মনে নিজের অতীতকেই যেন এক ঝলক দেখে নিলো। কি সুন্দর রক্তমাংসের মানুষ এখন সে। তার মতো সুখি আর কে আছে!

*সুখের নাগাল পেতে হলে*
*মানুষ হওয়া চাই,*
*'সবার ওপরে মানুষ সত্য*
*তাহার ওপরে নাই'।*

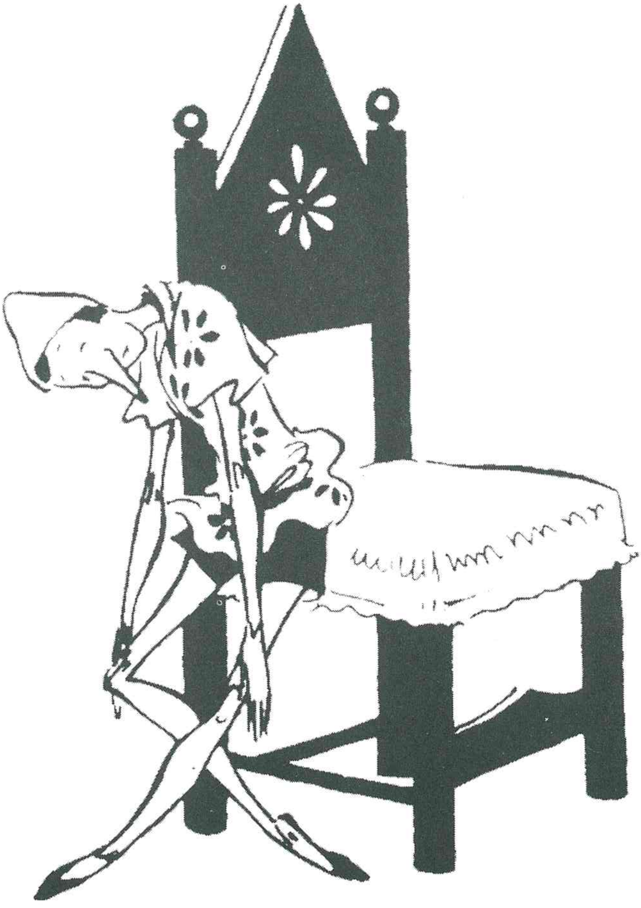

XIV. 1127-2

ISBN 984 08 0251 8
9 789840 802517

appl

একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি